TOMORROW'S SCIENTIST

প্রকাশিত

টমকিয়ন

বর্ষ পূর্তি সংখ্যা

নভেম্বর ২০২০

- ক্রিপ্টোগ্রাফি
- স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার
- চাঁদে পানি
- সিমুলেশন তত্ত্ব
- কার্দাশেভ স্কেল
- ডলবেয়ার
- ফার্মেটের নীতি

লেখকবৃন্দ

কে. এম শারিয়াত উল্লাহ

শাকির আহমেদ

মোঃ আক্তারুজ্জামান (SWAN)

আবিরা আফরোজ মুনা

শাহরিন উৎসব

জয় সরকার শুভ

নাবিদ হাসান

সম্পাদনা

কে. এম শারিয়াত উল্লাহ

শাকির আহমেদ

মোঃ আসাদুজ্জামান

কভার ডিজাইন

আহমেদ অভি

খুঁজে নিন

আমরা কারা? কি চাই?....4
রাতের আকাশ অন্ধকার কেন? 9
আমরা কি কোনো সিমুলেশনে বাস করছি?....12
ঁচাদে পানির অস্তিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে নাসা!....13
ডলবেয়ার....15
ঘড়ি দেখে উচ্চতা যেভাবে পরিমাপ করে!....18
কার্দাশেভ স্কেল ও এলিয়েন সভ্যতা....19
ভুলোমনের ওয়াইনার....22
পদার্থের পঞ্চম অবস্থা....24
মৌলিক সংখ্যার মৌলিকত্ব 27
ফার্মেটের নীতি - জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞানের নতুন রূপ....30
স্ট্র্যাঞ্জ ম্যাটার....37
সারোস চক্র ও গ্রহণের ভবিষ্যতবাণী....40
বামন গ্রহ....42
ঝিনুক থেকে মুক্তা তৈরি হয় কিভাবে?....44
বর্ণচোরা....45
টাইটানের কক্ষচ্যুতি....47
ক্লাউন ফিশ....48
লেখায় লুকুচুরি:ক্রিপ্টোগ্রাফির হাতেখড়ি....51
ইলেকট্রোজেনিক মাছগুলোর বিস্ময়কর ক্ষমতা....54

আমরা কারা? কি চাই?

কে. এম শারিয়াত উল্লাহ

গ্রুপটি মোটামুটি ভালোই বড় হয়েছে। এখন আমরা প্রায় সাড়ে সাত হাজারের একটি পরিবার। কিন্তু গ্রুপের অনেকেই এই গ্রুপটিকে অন্য যে কোনো বিজ্ঞানের গ্রুপ এর মতই মনে করে। সমস্যা এখানেই। আমাদের গ্রুপটিকে অন্য যে কোনো বিজ্ঞানের গ্রুপ থেকে আলাদা একটি উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছিলো। সেই উদ্দেশ্য ছিলো ‘ সহজে বিজ্ঞান প্রচার (যেটা অন্য

সকল গ্রুপই করার চেষ্টা করে) ও বিজ্ঞানী তৈরী করা (যেটা অন্য কোনো গ্রুপ করে না) '। কিন্তু আফসোস হলো তখন যখন গ্রুপের মেম্বার রা এটা না বুঝেই অন্যান্য গ্রুপের মতই এই গ্রুপটিকে নিয়ে নিল আর পোষ্ট করা শুরু করল অল্প কথায় বুঝানো। কিন্তু একটা কথা! অল্প কথায় বুঝাতে গিয়ে ও সহজ ভাষায় বুঝাতে গিয়ে তারা নিজেদের অজান্তেই বিজ্ঞানের নানা জটিল বিষয়কে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ফেলল। আরেকটি জিনিস! **(একটু রাফলি বলছি)** গ্রুপের মেম্বারদের অভ্যাস একটু খারাপ। ছোট আঁকারের পোষ্ট পড়ে। বড় আকারের পোষ্ট হলে তা এড়িয়ে চলে। ফলে যেখান থেকে আসল বিজ্ঞান পাওয়া যাবে, সেটা সে জানলই না। ক্ষুদে গল্প পড়তে গিয়ে ভুল ভাল বিজ্ঞান শিখে ফেলল।

তাই, এখন থেকে আমরা আমাদের আগের যেই উদ্দেশ্য ছিলো সেই উদ্দেশ্যতে ফিরে যাব! আমাদের এই গ্রুপটি হবে বাংলাদেশে বিজ্ঞানী তৈরীর অন্যতম একটি কারখানা। তোমরা যদি এই ক্ষেত্রে রাজি থাকো, তাহলে বাকি অংশ পড়তে পারো! নাহলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই!

ভাই! আমি তো বিজ্ঞানী হতে চাই না! আমি কি করব?

হ্যা। এ কথা সত্য। সকলের স্বপ্ন বিজ্ঞানী হওয়া নয়। সবাই যদি বিজ্ঞানী হয়ে যায়, তাহলে রাজনৈতিক নেতা কে হবে, ডাক্তার কে হবে, শিক্ষক হয়ে কে পরবর্তী বিজ্ঞানীদের তৈরি করবে? তাই বলছি, বিজ্ঞানী হওয়ার দরকার নেই! কিন্তু বিজ্ঞানীর যেই চিন্তা চেতনা তা তো ধারণ করা যেতেই পারে, নাকি? এর ফলে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়বে! তখন আর মাথায় আসবে না $(a+b)^2$ এর সূত্র শিখে কি লাভ হবে? তখন মাথায় আসবে চাকরীর বাজারে এই সূত্র কিভাবে খাটানো যায়। পিথাগোরাসের সূত্র পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখাস্থ না করে কিভাবে এই সূত্রের সাহায্যে দ্রুত রাস্তা পারাপার হওয়া যায় তা মাথায় আসবে! তাহলে তুমিই ঠিক কর কি করবে?

ভাই! আমি তো সাইন্সের স্টুডেন্ট না! আমি কি বিজ্ঞানী হতে পারব?

লুকা প্যচিওলো, আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের এর জনক। উনাকে কিন্তু বিজ্ঞানীই ডাকা হয়। ভূগোল বিদ্যার জনক ইরাটোস্থিনিস, মহান গণিতিবিদ ও বিজ্ঞানী। উনারা কোন গ্রুপের ছাত্র ছিলো বল তো?

আমি তো বিজ্ঞানী হতে চাই/ বিজ্ঞান এর প্রত্যেকটি বস্তু অনুভব করতে চাই? কিভাবে আগাবো?

এর জন্য প্রাথমিক ভাবে আমাদের গ্রুপে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ধীরে ধীরে সবগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। একনজরে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেখে নাও।

১) প্রশ্ন করা – সকল মানুষই গাছ থেকে আপেলটিকে পড়তে দেখেছিলো, শুধু নিউটনই প্রশ্ন করেছিলো, কেনো আপেলটি গাছ থেকে নিচে পরে গেল? কেন উপরে উড়ে গেল না? তার এই প্রশ্নই এনে দিয়েছিল আকর্ষণ বলের মত এক যুগান্তকারী ধারণাকে। তাই গ্রুপে খুব প্রশ্ন করতে হবে। তবে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়ঃ যে সকল পোস্টে প্রশ্ন আসবে সেই পোস্টের শুরুতে #tsq এই ট্যাগটি ব্যবহার করতে হবে। এর মাধ্যমে পরবর্তী যেকোনো সময়ে এই প্রশ্নটিকে খুজে পেতে সুবিধা হবে।

২) প্রশ্নতো করতে চাই! কিন্তু প্রশ্নটি এতই সহজ যে সকলেই হাসাহাসি করবে! তাই ... আমেরিকান জ্যোতিঃ পদার্থবিদ নীল ডি গ্রাস টাইসনের একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই,

> A scientist is a kid, who never grew up.
> বিজ্ঞানী হলো একজন শিশু যে কখনো বড় হয় নি।

কেননা সে এখনো প্রশ্ন করে, হাত থেকে ডিম ফেলে দিলে কি হবে? ছাঁদ থেকে লাফ দিলে কি হবে? এই ধরণের উদ্ভট প্রশ্ন। একজন বিজ্ঞানীও এই ধরণের উদ্ভট প্রশ্ন করে! 'আমি যদি একটি ইদুরের সাথে একটি বিড়ালের ক্রস ব্রিডিং ঘটায় তাহলে কি হবে?' তাই লোকসমাজের হাঁহাঁকে তোয়াক্কা না করে প্রশ্ন করে ফেল! হোক তা ফালতু! হোক তার উত্তর সকলে জানে! তুমি তো জানো না! তুমি নিজে জানার জন্য প্রশ্ন কর!

৩) বিজ্ঞান শিখতে চাই! কিন্তু রিসোর্স কোথায়? অনেক রিসোর্স আছে! শুধু জানার অপেক্ষা! গুগলে শুধু সার্চ দাও হাজার হাজার উত্তর পাবে কয়েক সেকেন্ডে। প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য Quora বেস্ট। রিসার্চ পেপার পড়তে চাও? Google Scholar, Nature ইত্যাদি আছে। গিয়ে একবার সার্চ করেই দেখ না! জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার Wikipedia (বাংলাটা বিশ্বস্ত নয়) । শুধু ইংরেজিটা হালকা ঝালাই করে নিতে হবে! আজ হোক বা কাল। বই পড়তে হবে! প্রচুর পড়তে হবে! পড়ার বিকল্প নেই! তাই বই পড়! বই পড়ার অভ্যাস কর! আগে বাংলা ভাষায় লেখা ভালো ভালো রাইটারের বই পড়! বেসিক বিজ্ঞান আগে পড়! শুরুতেই ব্ল্যাক হোল আর রিলেটিভিটি নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিও না! এতে অনেক ভুল ধারণা জন্মাতে

পারে। আগে পড় মেকানিক্স। **বিজ্ঞানচিন্তা** ম্যাগাজিনটাও ভালো। আমাদের গ্রুপেও আমরা নানান জিনিস আপডেট দেওয়া শুরু করব! কি কি আবিষ্কার হওয়া বাকি আছে তা নিয়ে!

৪) বিজ্ঞান পরে মজা পাই না! কি করব? কখনো নিউরণে অনুরণন বইটি পড়ার ট্রাই করেছ? বা প্রাণের মাঝে গণিত বাজে বইটি? বা অংক ভাইয়া? পরে দেখ গণিতের জন্য ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। আমি শিওর অন্যান্য বিষয়ের বইগুলোও তোমরা খুঁজে বের করতে পারবে। যখন একটা বিজ্ঞানের টপিক পড়ছ, তখন তা ফিল করার ট্রাই কর! কিভাবে তা কাজ করে তা কল্পনা করার ট্রাই কর। এই টপিকটির বাস্তবে কোথায় কোথায় প্রয়োগ হচ্ছে আর কোথায় কোথায় প্রয়োগ করা যায় বলে তুমি মনে কর, তা খুঁজে বের করে নোটবুকে টুকে রাখ।

৫) বিজ্ঞান তো বুঝলাম, গবেষণা কিভাবে করব? যেভাবে সুবিধা মনে হয় সেভাবে শুরু কর। গবেষণা করার জন্য ল্যাবের দরকার হয় না সবসময়। মনে রেখ, সবচেয়ে চমৎকার পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র $E = mc^2$ সূত্রটি আবিষ্কার হয়েছিলো একটি পেটেন্ট অফিসে। গণিতের চমৎকার করা সমীকরণ $0 = 1 + e^{i\pi}$ আবিষ্কার হয়েছিলো একটি বইয়ের মার্জিনে। তাহলে তোমার কৈফিয়ত কি? তবে গবেষণা করার আগে এই টপিকে বিশ্বে কোন কোন বিজ্ঞানী কাজ করেছেন তা গুগল করে বের করে নাও। তারা কিভাবে এর নানান সমস্যার সমাধান করেছেন, তা দেখে নাও। এতে হেল্প হবে।

অবশেষে বলতে চাই, **জিনিয়াস সে নয় যে ভালো প্রশ্ন করে, জিনিয়াস তো হলো সে যে এমন প্রশ্ন করে যা আগে কেউ করে নি।**

আমাদের ফেইসবুক গ্রুপে জয়েন করতে নিচের কোডটি স্ক্যান কর বা নিচে দেওয়া লিংকে ক্লিক কর

https://www.facebook.com/groups/831785003920374

রাতের আকাশ অন্ধকার কেন?

আবিরা আফরোজ মুনা

জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাইনরিখ অলবার্স **১৮২৬** সালে খুব সাধারণ একটি প্রশ্ন নিয়ে কুটাভাস তৈরি করেন। তার প্রশ্নটি হলো:

"রাতের আকাশ অন্ধকার কেন? মহাবিশ্ব যদি সুষমভাবে তারা পূর্ণ হতো তাহলে যেদিকেই তাকাই না কেন আমাদের দৃষ্টি কোন না কোন তারার পৃষ্ঠে গিয়ে পৌঁছানোর কথা আর সেক্ষেত্রে রাতের আকাশ অন্ধকার হওয়ার কথা নয়।"

আসলেই তো! তাহলে রাতের আকাশ অন্ধকার কেন? প্রশ্নটির উত্তরে প্রথম যা মাথায় আসে তা হচ্ছে, আরেহ! সূর্য না থাকলে অন্ধকার তো দেখাবেই! কিন্তু না, ঐ যে হাইনরিখ অলবার্স যা বললো, তাতে রাতে আকাশ দিনের মতোই উজ্জ্বল থাকার কথা না? তবে কেন আমাদের রাতের আকাশ অন্ধকার দেখি?

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের আগ পর্যন্ত ভাবা হতো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাবিশ্ব অপরিহার্যভাবে ধ্রুব থাকে। সম্ভবত মহাবিশ্ব অসীম সময় ধরে অস্তিত্বশীল। কিন্তু নক্ষত্রগুলো যদি অসীম সময় ধরে বিকিরিত হতো, তাহলে তারা পুরো মহাবিশ্বকেও তাদের মতো তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে তুলতো না? এমনকি রাতের বেলায়ও পুরো আকাশ সূর্যের মত উজ্জ্বল দেখাতো! কারণ আমাদের দৃষ্টির প্রতিটি রেখা শেষ হতো কোন না কোন নক্ষত্রের কিংবা ধুলোর মেঘে। আর এই ধুলোর মেঘগুলো নক্ষত্রদের মতো তাপমাত্রায় না পৌছানো পর্যন্ত উত্তপ্ত হতেই থাকতো। তাহলে আমরা ধারণা করতে পারছি যে নক্ষত্রগুলো বিগব্যাং এর সময় সৃষ্টি হয়ে একই জায়গায় অবস্থান করে অসীম সময় পর্যন্ত আলো ছড়াতে পারেনি। যদি পারতো তাহলে রাতের আকাশও আমরা উজ্জ্বল দেখতাম। তাহলে ঠিক কোন কারণে আমরা উজ্জ্বল না দেখে অন্ধকার দেখছি?

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সেই ভাবনা মিথ্যা প্রমাণিত করে দেন বিজ্ঞানী হাবল। তিনি একটি অসাধারণ বিষয় আবিষ্কার করেন। তিনি বের করলেন অন্য গ্যালাক্সিগুলো থেকে আসা আলো বিশ্লেষণ করে গ্যালাক্সিগুলো আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

নাকি আমাদের কাছে সরে আসছে তা পরিমাপ করা যায়। এই পদ্ধতিতে হাবল দেখলেন প্রায় অধিকাংশ গ্যালাক্সিই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, যে গ্যালাক্সি আমাদের কাছ থেকে যত দূরে, সেটি তত বেশি দ্রুতবেগে সরে যাচ্ছে। তিনি বুঝেছিলেন বৃহৎ পরিসরে প্রতিটি গ্যালাক্সি অন্য সব গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। গ্যালাক্সিগুলো যদি এভাবেই পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবে অতীতের কোন একটা সময় তারা অবশ্যই একসাথে ছিল। মহাবিশ্বের বর্তমান প্রসারণ হার থেকে হিসাব করে বের করা যায় ১০ থেকে ১৫ বিলিয়ন বছর আগে গ্যালাক্সিগুলো সত্যি সত্যিই পরস্পরের খুব কাছে ছিল। এই বিলিয়ন বছর পূর্বের বিগ ব্যাং থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আলো যতদুর পৌঁছেছে আমরা কেবল ততটুকুই দেখতে পারি। আর কোন নক্ষত্রই মহাবিস্ফোরণের পর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এই ১০ বা ১৫ বিলিয়ন বছর সময় আলো ছড়াতে পারেনি। তাই দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আলো এখন আমাদের নিকটে পৌঁছে নি।

বিগ ব্যাং-এর পরে, প্রায় ৩ লক্ষ বছর পর্যন্ত মহাবিশ্বের উষ্ণতা এতটাই বেশি ছিল যে ফোটন, ইলেকট্রন আর প্রোটন একসাথে ভেসে বেড়াতে পারত। সেই ভাসমান ইলেকট্রনের ধাক্কায় ফোটন খুব বেশিদূর এগোতে পারত না। ফলে আকাশ ভরে থাকত উজ্জ্বল আলোয়। অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের আকাশ আজকের তুলনায় যে অনেকটা বেশি ঝলমলে ছিল সেটা পরিষ্কার। কিন্তু প্রসারণের সাথে সাথে উষ্ণতা কমতে কমতে যখন ৩ হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াসের কাছাকাছি এল, তখন থেকে শুরু হল ইলেকট্রন আর প্রোটন একজোট হয়ে হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরি প্রক্রিয়া।

বিংশ শতাব্দীর জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা আলোর বর্ণালি-বিক্ষণের মাধ্যমে মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন মেঘের উপস্থিতি প্রমাণ করেছেন। যেহেতু মহাবিশ্বের প্রসারন ঘটছে সেহেতু দূরবর্তী ছায়াপথের নক্ষত্র থেকে আসা আলোদের লোহিত সরন বেশি তথা তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি তাই এদের শক্তি কমতে থাকে। এজন্যই এই আলোগুলি সহজেই হাইড্রোজেন গ্যাসের মাধ্যমে শোষিত হয়ে যাবে। এসব গ্যাস আমাদের আকাশগঙ্গাসহ প্রায় সব গ্যালাক্সিগুলোতে ছড়িয়ে আছে। যার অনেক দূরের কোন নক্ষত্র থেকে আসা আলো অধিক লোহিত সরনের কারণে শক্তি হারিয়ে হাইড্রোজেন মেঘ দ্বারা শোষিত হওয়ার কারণে আলো আমাদের নিকট এসে পুরোপুরি পৌঁছে না। আর তার চেয়েও দূরের গ্যালাক্সি ও নক্ষত্র থেকে বের হওয়া আলো

এখনো অনেক অনেক দূরে আছে। ঠিক যতগুলো উৎস থেকে আলো এসে পৃথিবীতে পৌছায় ততোগুলোই আমরা দেখতে পাই।

হিসেব কষে দেখা গেছে, মহাবিশ্বের এই প্রসারণের ব্যাপারটা যদি না থাকত, আর তার বয়সটা যদি আরও একটু কম হত, তাহলে রাতের আকাশের ঔজ্জ্বল্য প্রায় ৫০০০ কোটি গুণ বেড়ে যেত। সুতরাং ক্রমশ প্রসারণশীল মহাবিশ্বে ঘন অন্ধকারে ভরা। রাতের আকাশ দেখা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই। আর এজন্যই রাতের আকাশ অসংখ্য নক্ষত্র থাকার সত্যেও আমরা রাতের আকাশকে অন্ধকার দেখি! আর, মহাবিশ্বের প্রসারণ যতদিন চলবে, রাতের আকাশ আরো গভীর থেকে গভীরতর আঁধারে ডুবতে থাকবে!

আমরা কি কোনো সিমুলেশনে বাস করছি?

কে. এম শারিয়াত উল্লাহ

২০০৩ সালের দিকে Nick Borstom একটি পেপার পাবলিশ করেন এবং সেই পেপারের তিন নাম্বার যে proposition ছিল তা হলো- *" We are almost certainly living in a computer simulation"* প্রথমদিকে তার এই হাইপোথিসিস কোনো পাত্তাই পায়নি। তাই খুব ভালো মানের জার্নালেও সেটি পাবলিশ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে তার এই ধারণাটি পরিচিতি পেতে শুরু করে।

তার এই হাইপোথিসিস বর্তমানে *'the Simulation Argument'* নামে পরিচিত এবং অনেক বিজ্ঞানী এতে বিশ্বাসও শুরু করছে যেখানে বাকিরা সন্দেহে আছে। *Scientific American* কে দেওয়া এক বিবৃতিতে মার্কিন জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী *নীল ডি গ্র্যাস টাইসন* জানান, *"আমরা এই ধারণাকে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারব না। তাই ৫০% সম্ভাবনা রয়ে গেছে যে আমরা একটি কম্পিউটার সিমুলেশনে বাস করছি।"*২০১৬ সালে *এলন মাস্কের* দেওয়া কিছু ভাষণ হতে বিষয়গুলো আরো বিস্তার লাভ করে।

আমরা যদি কম্পিউটার সিমুলেশনে থেকে থাকি তাহলে-

1. আমাদের নিজেদের কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই। আমাদেরকে যেভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে আমরা সেভাবেই চলছি।
2. আমাদের কম্পিউটারের বাইরে একজন প্রোগ্রামার আছেন যিনি আমাদের প্রোগ্রাম করে দিয়েছেন।
3. আমরা যদি আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে যাই তাহলে অন্য প্রোগ্রামারের কম্পিউটারে চলে যাব। তাই আমাদের কোডের মধ্যে বাগ হিসেবে আলোর চেয়ে কম গতি সেট করে দেওয়া আছে। 'হয়তোবা এ কারণেই আমরা আলোর চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারি না'

সিমুলেশন এর এই ধারণাটি নতুন নয়। বরং গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কিছু চিন্তাধারায়ও এর উল্লেখ আছে বলে অনেকে মনে করেন।

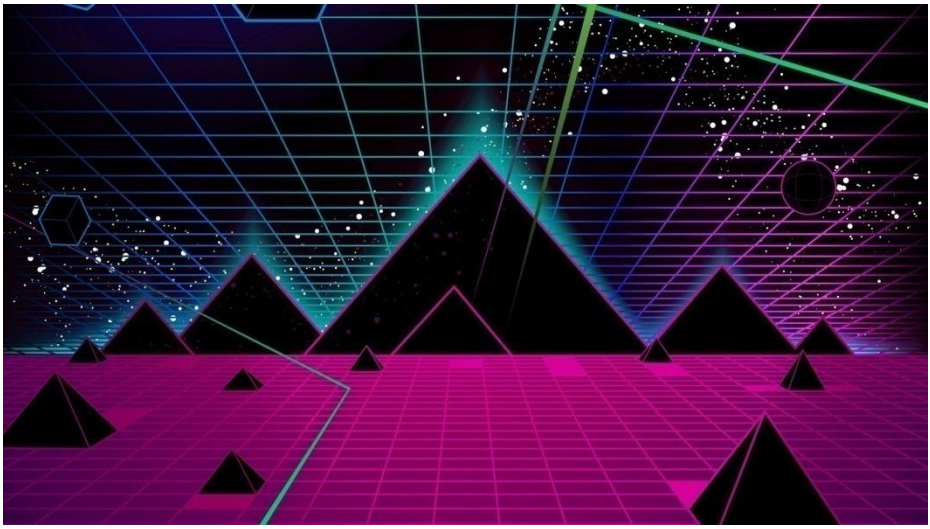

সম্প্রতি কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানী *ওহিদি* জানান, *"**কোয়ান্টাম জগতে যেমন সুপারপজিশনের কথা চিন্তা করা যায়, ঠিক তেমনিভাবে এখানেও তাই করা যায়। আপনি কোনো একটি বস্তুকে যে অবস্থায় দেখতে চান সে সেভাবেই আপনার দৃষ্টিতে দেখা দিবে। আপনি যার দিকে তাকিয়ে আছেন সেই বাস্তব। বাকি সব সিমুলেশন।"***

এই হাইপোথিসিস নিয়ে এখনো অনেক বিতর্ক আছে এবং এর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ দাড় করানো সম্ভব নয়। তাই অনেকে এই হাপোথিসিস নিয়ে চিন্তা করা সময়ের অপচয় বলে ধারণা করেন।

চাঁদে পানির অস্তিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে নাসা!

আবিরা আফরোজ

SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) প্রথমবারের মতো, চাঁদের সূর্যের পৃষ্ঠ দিকের অংশের উপরে পানি রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছ! এই আবিষ্কারটি ইঙ্গিত দেয় যে চন্দ্র পৃষ্ঠে পানি কেবল ঠাণ্ডা, ছায়াযুক্ত জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়,বরং চাঁদের সমস্ত পৃষ্ঠে পানি সমানভাবে বণ্টিত!

সোফিয়া চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত, পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান বৃহত্তম এক বৃহদাকার ক্লেভিয়াস ক্র্যাটারে পানির অণু (H_2O) সনাক্ত করেছে। পূর্বের পর্যবেক্ষণগুলি চাঁদের পৃষ্ঠের হাইড্রোজেনের কিছু ফর্ম সনাক্ত করেছে; তবে পানি এবং তার ঘনিষ্ঠ রাসায়নিক আত্মীয় হাইড্রোক্সিল (OH) এর মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম ছিল। এই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতি 100 মিলিয়ন থেকে 412 মিলিয়ন ঘনত্বের অংশের মধ্যে পানি শনাক্ত হয়েছে বলে প্রকাশিত হয়; যা কিনা প্রায় 12 আউন্স পানির বোতলের সমান।

পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত ফলাফল *Nature Astronomy*- এর সর্বশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

ডলবেয়ার

শাহরিন উৎসব

ইট-পাথরের জগতে নতুন নতুন প্রযুক্তির আধুনিক সব অনুষঙ্গে আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছি গ্রামীন পরিবেশের অদ্ভুদ মায়াময় প্রকৃতিই পারে আমাদের চাহিদার সকল অনুষঙ্গকে রহস্যময়তার সাথে প্রকাশ করতোশুধু তাকে উপলব্ধি করে খুঁজে নিতে হয়। প্রকৃতির সেই গানকে খুজে নিতে পেরেছিলেন ইউনিভার্সিটি অব কানেটিকাটে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের প্রফেসর এমোস এমারসন ডলবেয়ার।

গরমের কোনো এক অলস দুপুরে বাড়ির পেছনের উঠানে বসে রৌদ্দুর গায়ে মেখে নিচ্ছিলেন। আশপাশ হতে ঝিঁঝি পোকার নিরন্তর ডেকে চলা প্রফেসরের ভাবুক মনে ভাবনার উদায় ঘটাল। তিনি খেয়াল করলেন শব্দগুলো একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘটে চলেছিল। যেহেতু, উষ্ণতায় এদের শব্দ করার মাত্রা বেড়ে যায়, তিনি তাপমাত্রার সাথে ঝিঁঝির ডাকার শব্দকে তুলনা করে এটিকে একটা গানিতিক সূত্রের বাঁধনে বেধে দিতে চাইলেন। কিন্তু এটা তো নিজ ইচ্ছামতো করা যায় না।

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তাই শুরু করে দিলেন পরীক্ষনের। দিনের পর দিন পর্যবেক্ষন করতে থাকলেন তাপমাত্রা অনুযায়ী ঝিঁঝি পোকার শব্দ করার হার। তিনি মূলত কোন ধরনের ঝিঁঝি পোকার উপর পর্যবেক্ষন চালিয়েছিলেন তা নির্দিষ্ট করে দেননাই। তবে এটা ছিল তুষারময় গাছে ঝিঁঝি পোকা। এর অপর নাম থার্মোমিটার ক্রিকেট। এই প্রজাতির সঠিক বৈজ্ঞানিক নাম হলো *Oecanthus fultoni* এদের পুরুষের শব্দ করার পরিমান নারী ঝিঁঝির তুলনায় বেশি। ছক কাগজে তাপমাত্রার বিপরীতে প্রতি মিনিটে ঝিঁঝি পোকার শব্দের সংখ্যা বসিয়ে একটা গ্রাফ তৈরি করেন। তিনি লক্ষ করে দেখেন লেখটি লিনিয়ার অর্থাৎ একটা গানিতিক সম্পর্ক রয়েছে সম্পর্ক রয়েছে।

এটি থেকেই বের হয়ে আসে একটি অভূতপূর্ব সূত্র, যা ডলবেয়ারের সূত্র নামে পরিচিত।

ডলবেয়ারের সূত্র, $T=50+(X-40)/4$

যেখানে,

T=ফারেনহাইট স্কেলের তাপমাত্রা

X=প্রতি মিনিটে ঝিঁঝি পোকার শব্দ করার পরিমান।

এবার, অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এলো কিভাবে এই সূত্র। তাহলে যাওয়া যাক সে বিশ্লেষনে।

50 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় প্রতি মিনিটে ঝিঁঝি পোকা ডাকে প্রায় 40 বারের মত এবং যদি বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা 0.25 ডিগ্রি ফারেনহাইট বৃদ্ধি পায় তাহলে ঝিঁঝি পোকা গুলো প্রতি এক মিনিটে একটি করে অতিরিক্ত শব্দ করে।

যেহেতু ঝিঁঝি পোকার শব্দ করার সাথে তাপমাত্রার একটা সম্পর্ক রয়েছেতাই আমরা সহজেই লিখতে পারি,

$$T-T_1=m(X-X_1)$$

$$\text{Or, } T-50 =0.25(X-40)$$

$$\text{Or, } T-50=(X-40)/4$$

$$\text{Or, } T=50+(X-40)/4$$

এভাবেই আসে বিখ্যাত ডলবেয়ারের সূত্র।

সূত্রটাকে সহজে মনে রাখার জন্য, T=40+X

দিয়ে মনে রাখা যায়। যেখানে,

X=প্রতি পনের সেকেন্ডে ঝিঁঝি পোকা ডাকার সংখ্যা।

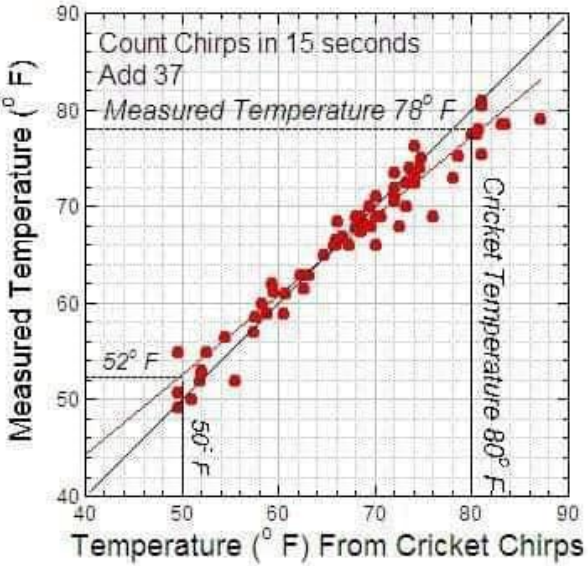

তবে যে কিছু বিশেষ ফ্যাক্টর যেমন তাপমাত্রা এবং প্রজননে সাফল্য ইত্যাদির জন্য এর চিরচেনা শব্দের পরিবর্তন করে।এ কারনবশত তাপমাত্রার পরিমাপটা একেবারে নিখুত হয় না। তবে ডলবেয়ারের এই সূত্রটি প্রায় কাছাকাছি মানের তাপমাত্রা নির্দেশ করতে পারে। এই প্রজাতির নারীরা অন্য কোনো প্রজাতির ক্রিকুয়েন্সীর শব্দতে আকৃষ্ট না হয়েই স্বপ্রজাতির পুরুষের ক্রিকুয়েন্সীকে পার্থক্য করতে পারে। এই বিশেষ ক্ষমতাকে ক্যারিয়ার ক্রিকুয়েন্সী বলে। এক্ষেত্রে নারীরা কম সংখ্যার ক্রিকুয়েন্সী শব্দগুলোকে শনাক্ত করে কারন এ ধরনের পুরুষের মূলত বীর্যের পরিমান বেশি থাকায় ভবিষ্যত প্রজন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি সহজতর হয়।
মূলত, সত্যিকার অর্থেই গনিত মানব সৃষ্ট কোনো রহস্য নয়, বরং প্রকৃতির একটা অংশ যাকে খুঁজে নিতে হয়,যা করার খুঁজে বের ক্ষমতা খুব কম ব্যক্তিরই হয়েছে।

ঘড়ি দেখে উচ্চতা যেভাবে পরিমাপ করে!

কে. এম শারিয়াত উল্লাহ

জার্নি টু দি সেন্টার অফ দি আর্থ মুভিটা যারা দেখেছ তারা হয়তোবা লক্ষ্য করেছ Brendan Fraser এক জায়গায় পাহাড়ের উচ্চতা মাপতে একটি পাথর নিচে ফালায় আর সময় কাউন্ট করে বলে দেয় যে এত গভীর। কিন্তু কিভাবে?

ব্যাপারটা খুবই সহজ। **৯-১০** ফিজিক্স ব্যবহার করেই এসব বের করে ফেলা যায়।

নিয়ম

পাথর কে ছেড়ে দাও ও ছেড়ে দেওয়ার সময় কোনো বল প্রয়োগ করবে না এবং ছাড়ার সাথে সাথে সময় কাউন্ট করবে। মনে কর একদম নিচে পাথরটি পৌঁছতে সময় লেগেছে 5 সেকেন্ড। প্রথমে এই সময় (5 সেকেন্ড) কে দুইবার গুণ দিবে ($5 \times 5 = 25$)। গুনফলকে **16** দিয়ে গুণ দিবে ($25 \times 16 = 400$) এটাই দূরত্ব। অর্থাৎ ৪০০ ফুট। (বিঃদ্রঃ এটা ৪০০ ফুট। ৪০০ মিটার না)

ব্যাখ্যা

মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর আদিবেগ শূন্য। তাই দূরত্ব $\mathrm{h} = \frac{1}{2}\mathrm{gt}^2$
দৈর্ঘ্য ফুটে বের করতে চাইলে g এর মান ৩২ ধরবে। মিটারে বের করতে চাইলে ৯.৮ (সুবিধার জন্য **১০** ধরা যায়) ধরবে। এর অর্ধেক মানে **১৬** (বা মিটারের জন্য ৫) এর সাথে সময়ের বর্গ গুণ দিলেই হয়ে যায়।

প্রতিধ্বনি ব্যবহার করেও মাঝের দূরত্ব বের করা যায় যেটা উল্লেখ ছিল জুল ভার্নের লেখা জার্নি টু দি সেন্টার অফ দি আর্থ বইয়ে। সেটা নিয়ে নাহয় আরেকদিন আলোচনা করব।

কার্দাশেভ স্কেল ও এলিয়েন সভ্যতা

শাহরিন উৎসব

13·4 বিলিয়ন বছর আগে মহাবিস্ফোরনের মাধ্যমে যে বিশ্ব বহ্মান্ডের সূচনা হয়েছিল বলে ধারনা করা হয়, সময়ের পরিক্রমায় এ বিশাল অঙ্গনের কোনোএক সীমানায় সোলার সিস্টেমের আওতায় পৃথিবী নামক গ্রহে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে ছিল মানুষ নামক এক জাতির, তাই বিশ্ববহ্মান্ডের বয়সের তুলনায় মানব প্রজাতির অস্তিত্ব 0·0015% বছর।

এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্বের সূচকে এগিয়ে থাকা মানব প্রজাতি গড়ে তুলেছে সভ্যতা আর ক্রমউন্নতির প্রয়াস রয়েছে অব্যহত।

1964সাল। সোভিয়েত এস্ট্রোনমার নিকলাই কার্ডাসেভ একটি হাইপোথিটিক্যাল স্কেল তৈরি করেন যার মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতাকে তিনটিভাগে বিভক্ত করেন। এটিই The Kardasav scale·· নামে পরিচিত। কোনো সভ্যতা কতটা শক্তি ব্যবহার করছে তার উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয় এই স্কেল। এবার চলেন চলে যাই সভ্যতার প্যারামিটারে।

সভ্যতা টাইপ নির্নয়ে একটি বিশেষ সূত্রের ব্যবহার করা হয়।

$K = (\log_{10}P-6)/10$

এখানে,

k=সভ্যতার রেটিং

P=যে শক্তি সভ্যতাটি ব্যবহার করছে, ওয়াট।

এই সূত্রটি প্রনয়ন করেন কার্ল সাগান।

Type1: এটি প্ল্যানেটারি সভ্যতা হিসেবেও পরিচিত। এই ধাপে মানব সভ্যতা সক্ষম হবে পৃথিবীতে আগত সকল সৌর শক্তিকে ব্যবহার উপযোগী শক্তিতে রূপান্তর করতে, যার পরিমান প্রায় বছরে হবে 1.74×10^{17} watts..

2.সম্ভবনাময় বিপুল পরিমান এন্টি মেটার আর মেটারের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষে উৎপন্ন করা হবে বিপুল পরিমান শক্তি,যেটি নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত শক্তি থেকে অনেক বেশি।

3. নবায়ন যোগ্য সকল শক্তি যেমন সোলার এনার্জি, বায়ু ফুয়েল, বায়ু আর হাইড্রো ইলেকট্রিক শক্তি ব্যবহার করা হবে।

Type2: 1. এটির অপর নাম হবে স্টেলার সভ্যতা। এই সভ্যতা পৃথিবী সূর্যের সকল শক্তিকে আহরন করতে নির্মান করে ফেলবে বহুল আলোচিত Dyson sphere বা Dyson swarm নামক বিখ্যাত হাইপোথিটিক্যাল যন্ত্র। এটি পৃথিবীতে করা ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের মত কিছুটা। এই যন্ত্রটি সূর্যকে এমনভাবে ঘিরে রাখবে যেন সেটি পারে সকল আউটপুট কে ইনপুট শক্তিতে রূপান্তর করতে। যেটি সেকেন্ড 4×10^{33}erg এর কাছাকাছি। এটির প্রবক্তা ছিলেন Freeman Dyson.

2. পৃথিবীবাসীকে এস্ট্রোয়েডের হাত থেকে বাঁচানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দিতে প্রয়োজন হবে এস্ট্রোয়েড মাইনিং করতে সক্ষম এমন যন্ত্রের।

3. মানুষ সূচনা করবে প্ল্যানেটারি যুগের অথ্যাৎ সোলার সিস্টেমের অন্যান্য গ্রহকে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র দিয়ে কৃত্রিম বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করবে।

4. penrose process অর্থাৎ ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজনের বাইরে নির্গত শক্তিকে আহরন করার মত বড় পরিকল্পনা করা হবে। ইতিমধ্য রজার পেনরোজ কৃষ্ণগহ্বর উপর অবদান রাখায় ফিজিক্সে নোবেল পুরষ্কারেও ভূষিত হয়েছেন। এ ধাপের সমগ্র শক্তির পরিমান ধরা হয়, 10^{26} watts.

Type3: হাইপোথিসিস অনুসারে এই ক্ষমতা গ্যালাকটিক লেভেল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে বলে মনে করার দরুন এটির অপর নাম গ্যালাকটিক সভ্যতা। এই ধাপে প্রযুক্তিগুলা টাইপ দুই এর মত হলেও প্রযুক্তি ব্যবহারের চিন্তা রয়েছে ব্যাপক পরিসরে। এ প্রয়োগ নয় সীমাবদ্ধ আমার, গ্যালাক্সিতে সীমা ছাড়াবে অন্য গ্যালাক্সিতে।এ পর্যায়ে হাইপোথিটিক্যাল যন্ত্র Dyson swarm দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে গ্যালাক্সিকে। এতে একদিকে যেমন সম্ভব হবে শক্তির সংগ্রহের অপর দিকে মহাজাগতিক প্রানী যদি থেকেই থাকে তাদের দৃষ্টিসীমানার অন্তরালেও থাকা সম্ভব হবে। তখন, সেকেন্ডে4×10^{44}erg এর কাছাকাছি এনার্জি আহরিত হবে গ্যালাক্সি থেকে। গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা সুপার মেসিভ ব্ল্যাকহোলকে ব্যবহার করা হবে শক্তির যোগান দাতা হিসেবে। মানুষ ঘুরবে গ্রহ থেকে গ্রহে। এই ধারনাকে বিজ্ঞানী মহল কোনোভাবে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে না কারন ইতিমধ্যে মানুষের মস্তিষ্কে চিপ সংযোজনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। তাই ভবিষ্যতের জন্য ধারনা করা যায়, ক্রমান্নতির এমন পর্যায় পৌঁছাবে যখন মানুষ বায়োলজিক্যালি আর যান্ত্রিকভাবে বিবর্তিত হয়ে ভিন্ন মানব জাতিতে পরিনত হবে। যাদের জন্য আলটিমেটলি একটি নামও প্রস্তাবনায় রাখা হয়েছে, সাইবর্গ। তারা যেন কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে বলেই মনে করা হয়।

তাহলে প্রশ্ন আসে আমরা কোন সভ্যতায় আছি!

এই হিসেব করতে 2015 সালে ব্যবহৃত শক্তির পরিমান (17·35tw)কে p এর মান হিসেবে বসিয়ে পাই,

K=0.72

অর্থাৎ, আমরা আছি টাইপ 0.72

আমাদের ক্রমোন্নতি লিনিয়ার নয় বরং তাহলো সূচকীয় যেহুতু এটি একটি লগারিদমিক স্কেল, তাই প্রতিটি সভ্যতার সাথে প্রতিটি সভ্যতার পার্থক্য অনেক বেশী। সভ্যতা এক, দুই, তিনে সীমাবদ্ধ নয়। চার, পাঁচ ও রয়েছে। এ ধাপে সাইবর্গদের যে স্রষ্টার মত ক্ষমতাধর বলে ভাবেন অনেকে। কিন্তু চার,পাঁচ কার্ডাসেভ স্কেলের অন্তর্গত নয়।

বিখ্যাত ফিজিসিস্ট মিচিও কাকুর মতে,

আগামী একশ-দুইশ বছরের মধ্যে মানুষ উন্নীত হবে টাইপ এক সভ্যতাই, টাইপ দুই অর্জনের লক্ষমাত্রা লক্ষ লক্ষ বছর আর টাইপ তিন সভ্যতা একশ মিলিয়ন বছর!

এতক্ষন আমরা ভ্রমন করলাম ভবিষ্যতের কিছু সম্ভাবনাময় স্বপ্নে। বিজ্ঞানী মহল মনে করেন মানব জাতির অদম্য যাত্রা রুদ্ধ করা সম্ভব নই, যদি না লক্ষ্যে যাত্রায় কোনো শক্তিশালী বিপর্যয়, এস্ট্রোরয়েড কিংবা কোনো ব্ল্যাকহোল গিলে নেই সম্পূর্ন মানব সভ্যতাকেই।

ভুলোমনের ওয়াইনার

কে. এম শারিয়াত উল্লাহ

আত্মভোলা একজন গণিতবিদ। বাসা পাল্টাচ্ছেন। কেমব্রিজ শহর থেকে যাচ্ছেন পাশের নিউটন শহরে। কিন্তু আজকে যে আবার MIT তে একটা লেকচার দেওয়ার কথা তার। তার সাথে গবেষণারও কিছু কাজ বাকি আছে। তাই গাড়িতে মালসামানা উঠিয়ে দেওয়ার সময় তার স্ত্রী তাকে বললেন বিকালে ফেরার পথে সে যেন তাদের এই পুরানো বাসায় চলে না আসেন। কিন্তু তার স্ত্রী জানতেন যে সে ভুলে যাবে। তাই কাগজে।নতুন বাসার ঠিকানা লিখে তা তার কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন তার স্ত্রী।

গণিতবিদ তার গবেষণায় ডুবে আছেন। হটাৎ করে তার মাথায় এলো এ অংকটা মনে হয় এভাবে হবে। তাই আশেপাশে কাগজ খুজছিলেন অংকটা করার জন্য। কিন্তু কাগজ পাচ্ছিলেন না। কোটের পকেটে হাত দিতেই একটুকরো কাগজ বেরিয়ে এলো। এক পাশে কি যেন লেখা, আরেকপাশের খালি জায়গাতেই অংক কষা শুরু করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ করেই বুঝতে পারলেন, এভাবে হবে না। তাই কাগজটা ছিড়ে ফেলে দিলেন। বিকালে তিনি বাড়ি ফিরে দেখেন বাসা খালি। তিনি হটাৎ করে মনে করলেন আজ বাসা বদলানোর কথা। আর তার ঠিকানা লেখা ছিলো কাগজে। খোজাখুজি শুরু করলেন। কিন্তু...? কাগজটা কোথাও পেলেন না। বাইরে বের হয়ে দেখলেন একটি মেয়ে দাড়িয়ে। তিনি মেয়েকে বললেন,

"এই মেয়ে শুনো। আমি Norbert Weiner. তুমি হয়তোবা আমাকে চিনো। আমার নতুন বাসার ঠিকানা কি তুমি জানো? "

মেয়েটি বলল, "আব্বু, আম্মু ঠিকই বলেছে। তুমি বাসার ঠিকানা ভুলে যেয়ে এখানেই হাজির হবে। চল। বাসায় চল।"

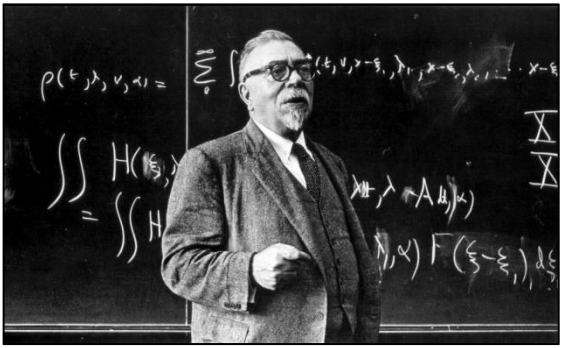

Norbert Weiner নামক এ ভদ্রলোকের এসব কথা ভুলে যাওয়ার অভ্যাস থাকলেও গণিত ও বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় (Aritificial Intelligence থেকে Chaos Theory) তার দক্ষতা আছে। মাত্র 11 বছর বয়সে গণিতে স্নাতক, 13 বছর বয়সে zoology তে স্নাতক, 17 বছর বয়সে Philosophy নিয়ে পড়াশোনা, 18 বছর বয়সে PhD কম্পলিট, 7 বছর বয়সে টাকা ইনকামের জন্য Slavic ভাষা শিখাতেন, দুই বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন কাজেই তার ব্যবহার কাজে লাগানো হয়েছে। Cybertronics, Robotics, Computer Control, automation এর মত অত্যাধুনিক বিজ্ঞানেও তার হাত আছে।

1964 সালের 18 March মহান এ গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী মৃত্যবরণ করেন।

পদার্থের পঞ্চম অবস্থা

মোঃ আক্তারুজ্জামান (SWAN)

পদার্থের অবস্থা কয়টি? আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে হয়ত আনার প্রাথমিক ভাবে সবাই শিখেছি পদার্থের অবস্থা ৩ টি। এগুলো হলো কঠিন, তরল,বায়বীয়। এই অবস্থাগুলো প্রতি নিয়ত পৃথিবীতে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। পাথর এবং বরফ কঠিন।জলে এবং তেল তরল। আমাদের শ্বসন গ্যাস বায়বীয়/গ্যাসীয়। এই তিনটি অবস্থা পরমানুর নিরপেক্ষ অবস্থার উপর ভিত্তি করেই বিভক্ত।

কিন্তু যদি আপনি কোন পরমাণুকেন্দ্র উচ্চশক্তিতে চালনা করেন এবং সমস্ত ইলেকট্রন কে শক্তিস্তর হতে বিচ্ছিন্ন করেন, তাহলে যে দশা তৈরি হবে তা এক আয়নিত অবস্থা। সহজ ভাষায়, এটি হলো পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজমা। কিন্তু এ ছাড়াও পদার্থের আরও দুটি অবস্থা আছে। এদের বলা হয় বোস আইনস্টাইন condenstate এবং ফার্মিওন condenstate. এসব অবস্থা পরীক্ষাগারে নানা রকম শর্তের ভিত্তিতে তৈরি করা যায়। কিন্তু এগুলো সরাসরি প্রত্যক্ষ না করলেও মহাবিশ্ব গঠনে এর অবদান অনস্বীকার্য।

আমাদের পৃথিবীতে সবকিছুই পরমানু দিয়ে তৈরি। পরমানুগুলো বন্ধনে অংশ নিয়ে তৈরি করে নতুন কিছু অথবা কোন কোন পরমাণু থাকে নিষ্ক্রিয়। তাপমাত্রা, চাপের শর্তমূলক বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে কঠিন, তরল ও বায়বীয় নির্ধারিত হয়। কিন্তু পদার্থ এর এই দশা এবং প্লাজমা দশা তো পারমানবিক ধর্মের মাঝেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কণার জগত তো আরও ক্ষুদ্র।

এ মহাবিশ্বের সমস্ত কণিকাগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়:

১.ফার্মিওনঃ এরা এমন কনিকা যাদের স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার মান 1/2, 3/2, 5/2... বা -1/2,-3/2...

২.বোসনঃ এই কনিকার স্পিন 0, 1, 2 ... বা -1,-2...

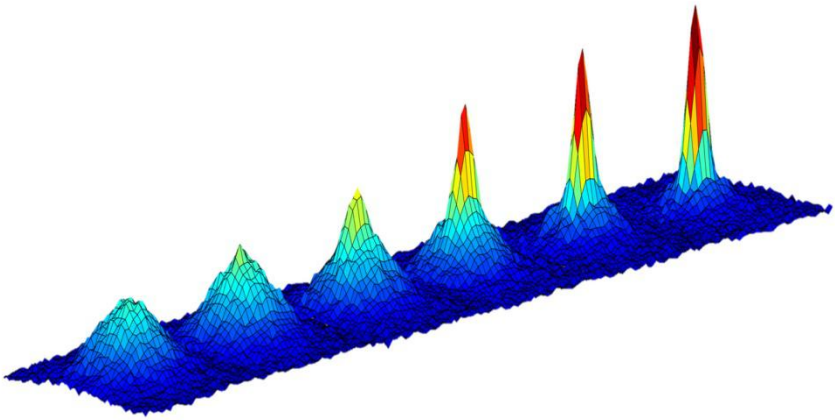

ইলেকট্রন এর স্পিন 1/2 বা -1/2। এটি ফার্মিওন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রোটন এবং নিউট্রন এর স্পিনও 1/2 বা -1/2 । যাই হোক এবার আপনি যদি প্রোটন ও নিউট্রন যুক্ত করেন তাহলে তৈরি হবে ডিউটেরন। এটির স্পিন তাহলে হতে পারে 0, 1 বা -1. ফলে তৈরি হবে একটি বোসন কণিকা

পাউলির বর্জননীতি কোয়ান্টাম মেকানিক্স এ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ নীতি অনুসারে, যেকোন দুটি ফার্মিওন কণিকা একই কোয়ান্টাম দশায় থাকতে পারবেনা। ধরুন কোন নিউক্লিয়াস পুরোপুরি ionized অবস্থায় আছে। এখন আপনি যদি এখানে অতিরিক্ত একটা ইলেকট্রন ঢোকান, তাহলে এটি সেই স্থান নেবে যেখানে energy configuration সর্বনিম্ন হবে

(ground state)।কিন্তু আপনি যদি ২য় ইলেকট্রন যোগ করতে চান, তাহলে এটিও ground state এ অবস্থান করতে চাইবে। কিন্তু একই কোয়ান্টাম দশায় আগের একটি ইলেকট্রন উপস্থিত। ফলে কোয়ান্টাম দশা ভিন্ন করতে হলে এই ইলেকট্রন টির স্পিন বিপরীত হবে। ফলে সমস্ত কোয়ান্টাম সংখ্যা একই হলেও স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা ভিন্ন হবে। এটাই পাউলির বর্জন নীতি। এমনিভাবে, আপনি ইলেকট্রন যোগ করতে চাইলে প্রতিবারই পাউলির বর্জননীতি অনুসৃত হবে।

কিন্তু এই ঘটনাটি boson কণিকারূপে জন্য প্রযোজ্য নয়। আপনি যত ইচ্ছে বোসন কণিকা ground state এ রাখতে পারবেন। আপনি যদি সঠিক ভৌত অবস্থা বজায় রাখেন যেমনঃবোসন এর শীতলীকরণ অথবা একই ভৌত অবস্থায় আবদ্ধ করেন যাতে এই বোসন কণিকা সর্বনিম্ন energy configuration এ অবস্থান করে তাহলেই পাওয়া যাবে বোস আইনস্টাইন condenstate.

হিলিয়াম এমন একটি পরমাণু যার রয়েছে ২ টি প্রোটন, ২ টি নিউট্রন এবং ৪ টি ইলেকট্রন। এটি এমন একটি পরমাণু যেটি জোড়সংখ্যক ফার্মিওন দিয়ে তৈরি এবং এটি আচরণ করে বোসন কণার ন্যায়। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় হিলিয়াম হয়ে যায় সান্দ্রতাবিহিন এক তরল যাকে বলা হয় superfluid. এই ঘটনাটি বোস আইনস্টাইন অবস্থার একটি ঘটনা। হিলিয়ামই প্রথম প্রাপ্ত বোসন যে কিনা এই পন্ঞ্চ ম অবস্থার উদাহরণ

মৌলিক সংখ্যার মৌলিকত্ব

শাহরিন উৎসব

মৌলিক সংখ্যাকে ইংরেজিতে prime number বলে। শব্দটির উৎপত্তি হয়েছিল ল্যাটিন শব্দ "*primus*" থেকে। *"primus"* শব্দটির অর্থ হলে 'first in importance' অর্থাৎ গুরুত্বানুসারে প্রথম। মূলত স্বাভাবিক সংখ্যার সেটে অর্থাৎ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... সংখ্যাসমূহের মধ্যে যেসব সংখ্যা 1 অপেক্ষা বড় এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য নয় সেগুলোকে মৌলিক সংখ্যা বলে । গনিতবিদ মৌলিক সংখ্যার আকার, ধরন এবং তারা পূর্নসংখ্যার সাথে কিভাবে সম্পর্কিত এগুলির উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি শ্রেনীতে ভাগ করেছেন।

(১)Fermat primes: পিয়েরে ডি ফার্ম্যাট সর্বপ্রথম এ ধরনের মৌলিক সংখ্যা ব্যবহার করেন। মূলত,$F_n= 2^{2^n} + 1$ আকারের মৌলিক সংখ্যা গুলাকে Fermat primes বলে। এগুলোকে Fermat numbers ও বলে, যেখানে n= অঋনাত্মক পূর্নসংখ্যা। অর্থাৎ

n=0, 1, 2, 3 ...

F_0=3

F_1=5

F_2=17

Fermat primes গুলোর ক্রম হলো- 3, 5, 17, 257, 65537, 4294967297 ...

(২) Mersenne primes: এ ধরনের মৌলিক সংখ্যা ফরাসী গনিতবিদ মেরিন মার্সেনের নামানুসারে মার্সেন প্রাইম বলে। এগুলো মার্সের নাম্বার হিসেবে পরিচিত।মার্সের প্রাইম হলো $Mn=2^{n-1}$ আকারের মৌলিক সংখ্যা যেখানে n ও মৌলিক সংখ্যা হবে ।অর্থাৎ n=2,3,5,7,13,.....

মার্সেন মৌলিক সংখ্যা গুলো হলো-

3, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287, 2147483647...

(৩) Sophie Germain (SG) primes: ফ্রেঞ্চ গনিতবিদ Sophe Germain এর নামানুসারে এধরনের মৌলিক সংখ্যাকে Sophe Germain primes বলে। একটি মৌলিক সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে তার সাথে 1 যোগ করে পাওয়া সংখ্যাটি যদি মৌলিক সংখ্যা হয় তবে সেই মৌলিক সংখ্যাটিকে সোফি জার্মেন মৌলিক সংখ্যা বলে। অর্থাৎ p ও 2p+1 যদি উভয়েই মৌলিক সংখ্যা হয় এরকম মৌলিক সংখ্যাগুলোকে সোফি জার্মেন মৌলিক সংখ্যা বলে।
সোফি জার্মেন মৌলিক সংখ্যা গুলো হলো -5, 7, 11, 23, 47, 59, 83, 107, 167, 179, 227, 263 ...

(৪) Twin Primes: p যদি একটি মৌলিক সংখ্যা হয় এবং p+2 ও যদি একটি মৌলিক সংখ্যা হয়, তবে p,p+2 হলো যমজ মৌলিক সংখ্যা।এ ধরনের মৌলিক সংখ্যা গুলোকে prime pair ও বলে। এ ধরনের মৌলিক সংখ্যার নামকরণ করেন জার্মান গনিতজ্ঞ পল গুসবব স্যামুয়েল স্ট্যাকেল। এ ধরনের জোড়া মৌলিক সংখ্যার অন্তফলের মান দুই। যেমন:

(3,5), (5,7), (11,13), (17,19), (29,31), (41,43), (59,61), ...

(৫) Cousin Primes: দুইটি মৌলিক সংখ্যার অন্তরফল 4 হলে তাদেরকে Cousine primes বলে।বাংলায় জ্ঞাতিভাই মৌলিক সংখ্যা। এর উদাহরন হলো:

(3,7), (7,11), (13,17), (19,23), (37,41), (43,47), ইত্যাদি।

7 হলো একমাত্র মৌলিক সংখ্যা যে দুইটি মৌলের সাথে Cousine prime সম্পর্কে আবদ্ধ।

(৬) Sexy Primes: যদি দুইটি মৌলিক সংখ্যার মধ্যবর্তী ব্যবধান 6 হয় তাহলে তাদের জোড়কে Sexy primes বলে। এটি ল্যাটিন শব্দ হতে এসেছে। এর উদাহরণ - (5,11), (7,13), (11,17), (13,19), (17,23), (23,29), ...

(৭) Cullen Primes: Reverend Cullen একধরনের মৌলিক সংখ্যাতে আগ্রহী ছিলেন। তার নামানুসারে এই মৌলিক সংখ্যা গুলোকে Cullen prime বলে। একে কুলেন সংখ্যাও বলে। $C_n = n.2^n + 1$ আকারের মৌলিক সংখ্যাগুলোকে Cullen prime বলে।
এখানে, n=1, 141, 4713, 5795, 6611 ...

(৮)Woodall Primes: সংখ্যাত্বত্তে $W_n = n.2^n - 1$ এখানে n= natural numbers এরূপের মৌলিক সংখ্যাকে Woodall primes বা Woodall numbers বলে। 1917 সালে Allan J.C Cunnigham এবং H.J Woodall এই সংখ্যাগুলো নিয়ে অধ্যায়ন করেন। অনেকক্ষেত্রে এই Woodall numbers কে' The cullen primes of the second kind ' হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়। Woodall numbers or Woodall primes এর প্রধান কয়েকটি সংখ্যা হলো-

1, 7, 23, 63, 159, 383, 895 ...

(৯) Wilson Primes: ইংরেজ গনিতবিদ John Wilson এর নামানুসারে এ মৌলিক সংখ্যার নামকরণ করা হয়েছে। একটি মৌলিক সংখ্যা যদি p হয় একটি উইলসন মৌলিক সংখ্যা হবে (p-1)!+1 সংখ্যাটি যদি p^2 দ্বারা বিভাজ্য হয়। এখন পর্যন্ত জ্ঞাত Wilson primes গুলো হলো 5,13,563। মনে করা হয় যদি এর বাইরে কোনো অস্তিত্ব থাকা তাহলে তা হবে 2×10^{13} এর উপর।

(১০) SPN (Super prime numbers): যদি কোনো মৌলিক সংখ্যা এমন হয় এর ক্রমের অবস্থানটিও একটি মৌলিক সংখ্যা তাহলে তাদেরকে SPN বলে।এদেরকে আবার Super prime number বা Higher order primes বা prime indexed primes or PIPs ও বলে।

মৌলিক সংখ্যা ক্রম হতে -

2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39

এখানে, 2 এর অবস্থান **১ম** এ।কিন্তু 1 মৌলিক সংখ্যা নয়,তাই 2 super primes নয়।

3 এর অবস্থান 2 এ। 2 একটি মৌলিক সংখ্যা। তাই 3 super primes.

এভাবে প্রাপ্ত সুপার প্রাইমের ক্রম হলো -3, 5, 11, 17, 31, 41, 59, 67, 83, 109, 127, 157, 179, 191 ...

(১১) Absolute prime number: এই ধরনের মৌলিক সংখ্যাকে পরম মৌলিক সংখ্যা বা বিন্যাসযোগ্য মৌলিক সংখ্যা বলে । এই সংখ্যাগুলোকে permutable prime বা angrammatic prime numbers ও বলা হয়। যদি কোনো সংখ্যাকে যেকোনো ভাবে সাজালেও সংখ্যাটি মৌলিক থাকে তাকে পরম মৌলিক সংখ্যা বলে। H.C Richat সর্বপ্রথম এটি নিয়ে অধ্যায়ন করে ছিলেন তখন সেটির নাম দেন permutable primes কিন্তু পরবর্তীতে এটিকে ডাকা হয় Absolute primes নামে। 10^3 এর মধ্যে অনুসন্ধান কৃত 21 টি Absolute primes হলো-

2, 3, 5, 7, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97, 113, 131, 199, 311, 337, 373, 733, 919, 991 ...

এরকম অসংখ্য মৌলিক সংখ্যা রয়েছে। যার বর্ণনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্পূর্নরুপে দেওয়া অসম্ভব।

ফার্মেটের নীতি - জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞানের নতুন রূপ

জয় সরকার শুভ

আজকে আক্কাসদের পদার্থ ক্লাসে জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞান অধ্যায়টি পড়ানোর সময় তাদের শ্রেণি শিক্ষক তাদেরকে ফার্মাটের ন্যূনতম সময়ের নীতিটা পড়িয়েছে। কিন্তু সে সেই নীতিটা বোঝেনি। আবার স্যারকে তা বলতেও পারেনি। কারণ, তার মাথায় হাজার হাজার প্রশ্ন ঘুরপাক খেলেও সে একটা ফেল্টুস ছাত্র। তার কোনো প্রশ্নের জবাব শিক্ষকেরা দেয় না। কিন্তু তাতে আক্কাসের কোনো সমস্যাই নেই। কারণ সে জানে তার এ প্রশ্নের উত্তর সে তার কুদ্দুস ভাইয়ার কাছ থেকে ঠিকই পেয়ে যাবে। তাই এখন সে ঐ নীতিটা বুঝিয়ে নেওয়ার জন্য তার কুদ্দুস ভাইয়ার কাছে এসেছে।

আক্কাস : হ্যালো কুদ্দুস ভাইয়া, কেমন আছো?

কুদ্দুস : ভালো। তুই কেমন আছিস, আক্কাস? আজকে আবার কি সমস্যা নিয়ে এসেছিস?

আক্কাস : ভালো আছি ভাইয়া। আজকে তোমার কাছ থেকে আমি ফার্মাটের ন্যূনতম সময়ের নীতিটা বুঝতে চাই।

কুদ্দুস : ও, এই ব্যাপার। এটা তো অসাধারণ একটা নীতি রে। এই নীতিতে আবার কোথায় সমস্যা হলো তোর?

আক্কাস: ভাইয়া নীতিটাতে বলা আছে - "আলোক রশ্মি, কোনো সমতলের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে অপর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে যাবার সময়, সবসময় সর্বনিম্ন পথে না যেয়ে সর্বনিম্ন সময়ের পথে যায়।"

কুদ্দুস : হুম ঠিকই তো আছে।

আক্কাস : কিন্তু ভাইয়া আমি এই নীতিটার সর্বনিম্ন পথ আর সর্বনিম্ন সময়ের পথ কথাটা বুঝতেছি না। এই দুটো জিনিস একই না?

কুদ্দুস : না, একই না। কোনো সমতলের একটি বিন্দু হতে অপর বিন্দুতে পৌঁছানোর সর্বনিম্ন পথ কোনটা বল দেখি?

আক্কাস: যেহেতু সমতল সেহেতু বিন্দু দুইটির সংযোজক সরলরেখাই হবে একটি বিন্দু হতে অপর বিন্দুতে পৌঁছানোর সর্বনিম্ন পথ। এটাই তো আমি জানি।

কুদ্দুস: হুম ঠিক বলেছিস। কিন্তু এই পথটাই যে সর্বনিম্ন সময়ের পথ হবে এমন তো কোনো কথা নেই।

আক্কাস: কেনো ভাইয়া ? আমরা যদি একটা ফুটবল মাঠের একটা বিন্দু হতে অপর বিন্দুতে সমবেগে পৌঁছাতে চাই , আর আমরা যদি ঐ বিন্দু দুইটির সংযোজক সরলরেখা মানে সর্বনিম্ন পথ বরাবর যাই তাহলেই তো আমাদের সর্বনিম্ন সময় লাগবে। অন্যপথে গেলে তো তার চেয়ে বেশি সময় লাগবে। কারণ অন্যপথে গেলে দূরত্ব বাড়বে আর সমবেগের ক্ষেত্রে s=vt বা, t=s/v (যেখানে v সমবেগ যা ধ্রুব'র মতো) অতএব আমরা বলতে পারি t s . (= সমানুপাতিক) . অর্থাৎ , দূরত্ব বাড়লে সময় বাড়বে বা বেশি লাগবে। আর আলোও যেহেতু সমবেগে চলে সেহেতু আলো যদি সমতলের একবিন্দু হতে অপরবিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য বিন্দু দুইটির সংযোজক সরলরেখা বরাবর যায় মানে সর্বনিম্ন পথে যায় তাহলেই তো তার সময় কম লাগবে। আর বাকি পথগুলো দিয়ে যেতে বেশি লাগবে। আর তাই আমরা বলতে পারি সর্বনিম্ন পথ আর সর্বনিম্ন সময়ের পথ একই জিনিস। তাই নয় কি ?

কুদ্দুস : না। কিছুটা ঠিক বলছিস কিন্তু পুরোটা ঠিক না। তুই যেই কথাটা বললি সেটা তখনই খাঁটবে যখন বিন্দু দুটির মধ্যবর্তী মাধ্যম একই থাকবে। মাধ্যম চেঞ্জ হলে তোর কথাটা আর খাঁটবে না।

আক্কাস : ভাইয়া বুঝলাম না তোমার কথাটা।

কুদ্দুস : বলছি , দাড়া। কিন্তু তার আগে তুই আমাকে এটা বলতো - তুই শক্ত মাটির উপর দিয়ে যত জোড়ে দৌড়াতে পারবি , বালি , কাঁদা কিংবা পানির মধ্যে দিয়ে কি তত জোড়ে দৌড়াতে পারবি ?

আক্কাস : না ভাইয়া। শক্ত মাটিতে অবশ্যই জোড়ে দৌড়াবো। কিন্তু বালি , কাঁদা কিংবা পানিতে তাদের গতির অভিমুখে বাঁধার কারণে জোড়ে দৌড়াতে পারবো না।

কুদ্দুস : ঠিক তেমনি আলো শূন্য মাধ্যমে যত জোড়ে চলতে পারে , অন্য মাধ্যমে তত জোড়ে চলতে পারে না, সেই মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্কের গতির অভিমুখে বাঁধার কারণে।

আক্কাস : হুম এটা তো জানি। কোনো মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্কের উপর , ঐ মাধ্যমে আলোর বেগ কত হবে তা নির্ভর করে।

কুদ্দুস : হুম। আর ফার্মাটের নীতি বুঝতে গেলে আমাদেরকে বিন্দু দুটিকে আলাদা মাধ্যমে রাখতে হবে। কমপক্ষে দুটো মাধ্যম লাগবে আমাদের। অর্থাৎ , এক মাধ্যমের একবিন্দু হতে আরেক মাধ্যমের অন্যবিন্দুতে আলো পৌঁছাবে। আর তখন আমরা দেখবো সর্বনিম্ন পথ এবং সর্বনিম্ন সময়ের পথ এক না। আর একই মাধ্যমের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন পথই সর্বনিম্ন সময়ের পথ। তাই বিন্দু দুইটি একই মাধ্যমে নিলে ফার্মাটের নীতিটা বুঝবি না।

আক্কাস : আহ্ ! তোমার কথাগুলো ঠিকমতো বুঝতেছি না । আমার সাথে এরকম খেয়ালিপনা করছো কেনো ভাইয়া ?

কুদ্দুস : কোনো খেয়ালিপনা করছি না রে। এখন বুঝবি এতক্ষণ ওসব আলোচনা করার মূল কারণ। আমি এখন একটা ছবি আঁকতেছি এটা দেখ **(চিত্র : 1)**। মনেকর , তুই সমুদ্র সৈকতে A বিন্দুতে দাড়িয়ে আছিস। আর B বিন্দুতে কেউ সমুদ্রে গোসল করতে যেয়ে ডুবে যাচ্ছে। সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। আশেপাশে আর অন্য কেউ নেই। এখন তোকে যেতে হবে লোকটিকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচাতে। এখন তাকে বাঁচাতে হলে তোকে তার কাছে সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে । এখন দেখ, তোর অবস্থান হতে লোকটিকে বাঁচাতে যাওয়ার সর্বনিম্ন পথ হবে A আর B বিন্দুর সংযোজক সরলরেখা বা ACB রেখাটি। যেখানে C বিন্দুটি A ও B বিন্দুর সংযোজক সরলরেখার উপর একটি বিন্দু যা সাগরের পানি হতে সমুদ্র সৈকতকে আলাদা করেছে। অর্থাৎ সরলরেখাটির AC দূরত্ব মাটি যা তুই দৌড়ে যেতে পারবি। আর CB দূরত্বটি পানি যা তোকে সাঁতার কেটে যেতে হবে। কিন্তু এছাড়াও তোর কাছে সম্ভাব্য আরো অনেকপথ আছে , যেগুলো সর্বনিম্ন পথ না। এর মধ্যে ADB একটা। যেখানে AD দূরত্বটি মাটি আর DB দূরত্বটি পানি। এখন যদি , AC=300m , CB=300m , AD=513m , DB=180m হয়।

তাহলে ACB পথের মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব, s'=AC+CB=(300+300)m=600m .

অন্যদিকে , ADB পথের মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব , s*=AD+DB=(513+180)m=693m .

দেখাই যাচ্ছে s*>s' . কিন্তু দেখা যাক তো কোন দূরত্ব অতিক্রম করতে বেশি সময় লাগবে ? s* পথ নাকি সর্বনিম্ন পথ s' ! তার আগে তুই বল তোর দৌড়ানোর আর সাঁতারের বেগ কি সমান ?

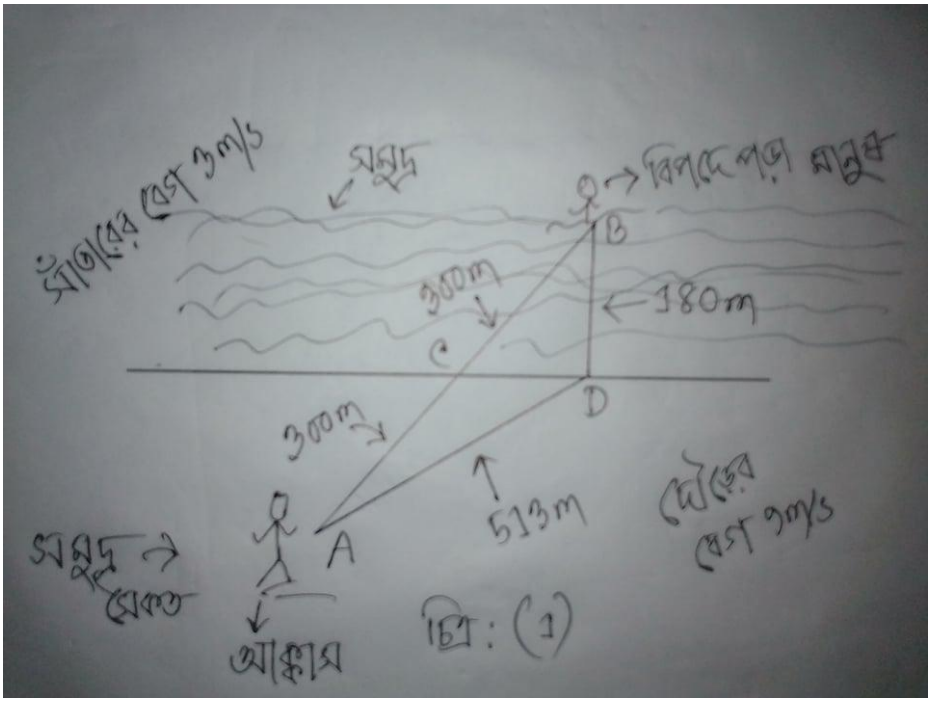

চিত্র ১

আক্কাস : না। আমার দৌড়ানোর বেগ মোটামুটি 9m/s কিন্তু সাঁতারের বেগ মাত্র 3m/s এর মতো।

কুদ্দুস : শুধু তুই কেনো প্রায় সব মানুষেরই ওরকম। সাঁতারের চেয়ে দৌড়ানোর বেগ অনেক বেশি। কারণ সাঁতারের আর দৌড়ানোর মাধ্যম ভিন্ন। চল এখন অঙ্কে ফিরে যাই। দেখ AC আর AD অংশ যেহেতু মাটির অংশ তাই এই অংশগুলো তুই দৌড়াবি, লোকটাকে বাঁচানোর জন্য। আর CB এবং DB যেহেতু পানির অংশ তাই এই অংশগুলো তুই সাঁতার কাটবি। আর দুইক্ষেত্রে তোর বেগ ভিন্ন হলেও তোর বেগ সমবেগ অর্থাৎ কোনো ত্বরণ মন্দন নেই। তাই তোর মাটিতে AC অংশ পাড়ি দিতে সময় লাগবে , t^{1}=300/9=33.34s এবং AD অংশ পাড়ি দিতে সময় লাগবে , t^{1}*=513/9=57s . আবার অন্যদিকে পানিতে CB অংশ পাড়ি দিতে সময় লাগবে, t^{2}=300/3=100s এবং DB অংশ পাড়ি দিতে সময় লাগবে, t^{2}*=180/3=60s. এখন দেখি কোন পথের সময় বেশি লাগলো।

s' বা ACB পথ অতিক্রম করতে মোট সময় লেগেছে , $t' = t^{1'}+t^{2'} = (33.34+100)s = 133.34s$ অপরদিকে s* বা ADB পথ অতিক্রম করতে সময় লেগেছে , $t^* = t^{1*}+t^{2*} = (57+60)s = 117s$. তাহলে এখান থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি $s'<s^*$ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু $t'>t^*$. অর্থাৎ লোকটিকে বাঁচাতে চাইলে তোর s* বা, ADB পথে যাওয়াই ভালো । কারণ এইপথে যদি তুই লোকটির কাছে যাস তাহলে s' পথের চেয়ে তোর বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা লাগলেও আগে পৌঁছাতে পারবি অর্থাৎ তোর সময় কম লাগবে । তাহলে এখন বুঝতেই পারছিস সর্বনিম্ন পথ আর সর্বনিম্ন সময়ের পথ এক জিনিস না । এ থেকেই বলা যায় সবসময় সর্বনিম্ন পথ আর সর্বনিম্ন সময়ের পথ সমান হয় না ।

আক্কাস: সুন্দর কথা বলেছো তো ভাইয়া । এর আগে তো এভাবে ভেবে দেখিনি ।

কুদ্দুস: হুম । আলোকপথ বুঝিস?

আক্কাস: হুম , কোনো মাধ্যমে একটি পথ অতিক্রম করতে আলোর যে সময় লাগে , ঠিক সেই সময়ে শূন্য বা বায়ু মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলো যে পরিমাণ পথ অতিক্রম করতে পারে সে পথকে আলোকপথ বলে ।

কুদ্দুস : হুম একদম ঠিক বলেছিস । আলোকপথের সূত্রটা জানিস তো ?

আক্কাস: হুম ভাইয়া জানি ।

আলোকপথ (l) = মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক × ঐ মাধ্যমে আলোর অতিক্রান্ত দূরত্ব ।

কুদ্দুস: তুই তো সবই জানিস দেখছি, গুড । আর সমতলে আলো সবসময় সর্বনিম্ন আলোকপথেই যায় । যেটা আমাদের ফার্মাটের নীতি বলে । আর সর্বনিম্ন আলোকপথই হলো সর্বনিম্ন সময়ের পথ । আয় এটা ভালো করে বোঝার জন্য আমরা আরেকটা অঙ্ক করি চল ।

আক্কাস: ঠিক আছে করো ।

কুদ্দুস: তার আগে আমি একটা ছবি আঁকাইতেছি এটা দেখ **(চিত্র : 2)** । মনেকর K বিন্দু হতে আলো M বিন্দুতে যাবে । এখন K বিন্দুটা আছে কাঁচ মাধ্যমে যার প্রতিসরণাঙ্ক 1.6 । কিন্তু M বিন্দু আছে শূন্য/বায়ু মাধ্যমে যার প্রতিসরণাঙ্ক 1 । এখন মাধ্যম দুটির বিভেদ তলের উপর X ও Y দুটি বিন্দু রয়েছে । যেখানে X বিন্দুটি K এবং M বিন্দুর সংযোজক সরলরেখার উপর

অবস্থিত । অর্থাৎ K হতে M বিন্দুতে পৌঁছানোর সর্বনিম্ন পথ KXM . আবার KYM হলো K হতে M বিন্দুতে পৌঁছানোর সম্ভাব্য আরেকটি পথ ।

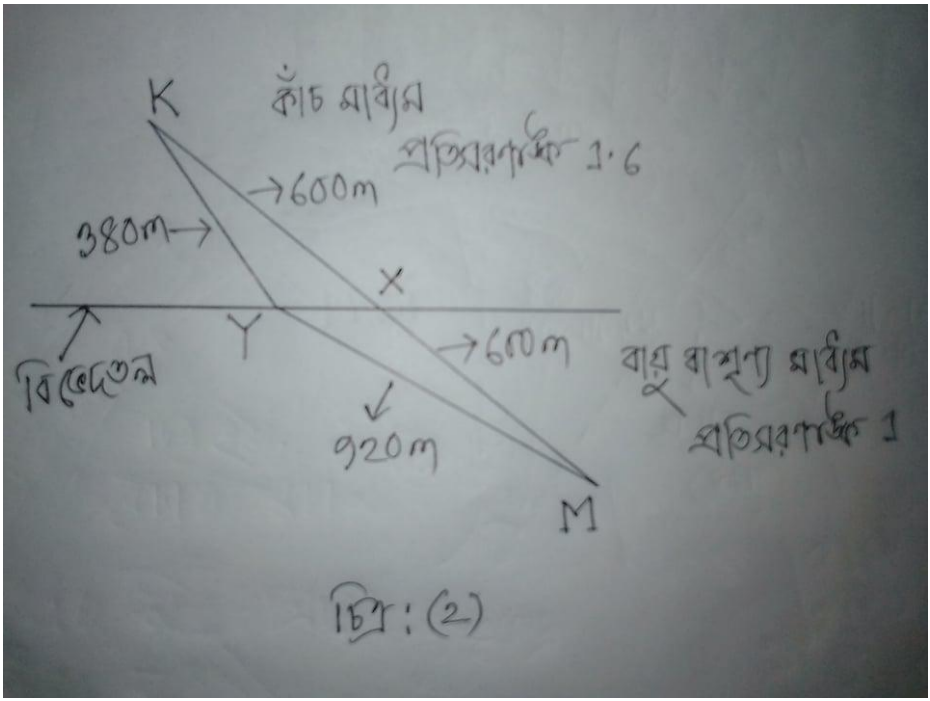

চিত্র ২

আক্কাস : হুম ।

কুদ্দুস : তাহলে এখন যদি KX=600m , XM=600m, KY=380m , YM=920m হয় তাহলে সর্বনিম্ন পথে অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে , KXM=(600+600)m=1200m আর সম্ভাব্য পথে অতিক্রান্ত দূরত্ব হবে, KYM=(380+920)m=1300m. অর্থাৎ সাধারণ পথের ক্ষেত্রে KXM<KYM . কিন্তু আমরা যদি এদের আলোকপথ বের করি তাহলে কোন আলোকপথটা ছোট হয় দেখি । এখন আলোকপথ বের করার ক্ষেত্রে KX যেহেতু কাঁচ মাধ্যমে অবস্থিত তাই এর আলোকপথ হবে , l^{1}=(600×1.6)m=960m , আবার XM যেহেতু বায়ু/শূণ্য মাধ্যমে অবস্থিত তাই তার আলোকপথ হবে , l^{2}=(600×1)m=600m , আবার KY ও কাঁচ মাধ্যমে অবস্থিত তাই তার আলোকপথ , l^{1}*=(380×1.6)m=608m এবং YM বায়ু/শূণ্য মাধ্যমে

অবস্থিত তাই এর আলোকপথ, $l^{2}*=(920\times1)m=920m$. তাহলে KXM পথটির আলোকপথ , $l'=l^{1}'+l^{2}'=(960+600)m=1560m$ আর অন্যদিকে KYM পথটির আলোকপথ, $l*=l^{1}*+l^{2}*=(608+920)m=1528m$. তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি KYM পথটির আলোকপথ KXM পথটির আলোকপথের চেয়ে ছোট। আর যে আলোকপথ ছোট , সেই আলোকপথে আলোর যেতে কম সময় লাগবে । কেনো লাগবে তা আমরা আলোকপথের সংঙ্গাটা ভালো করে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবো, কারণ শূন্য মাধ্যমে আলোর অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের সমানুপাতিক, তাই শূন্য মাধ্যমে আলোর অতিক্রান্ত দূরত্ব যত কম হবে সময় তত কম লাগবে। তাই K থেকে M বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য আলো KXM পথটি অর্থাৎ সর্বনিম্ন পথটি ব্যবহার না করে সর্বনিম্ন সময়ের পথ বা সর্বনিম্ন আলোকপথ KYM পথটি ব্যবহার করে । আর ফার্মাটের ন্যূনতম সময়ের নীতির মূলবক্তব্যই এটা । আশাকরি এখন বুঝেছিস।

আক্কাস: হুম ভাইয়া । একদম ক্লিয়ার । অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে । এখন তাহলে আসি আমি।

কুদ্দুস : ঠিক আছে আয়।

আক্কাসকে বিদায় দিয়ে কুদ্দুস তার কাজে লেগে পড়লো। আর আজকের মতো আমার গল্প এখানেই ফুরালো।

স্ট্র্যাঞ্জ ম্যাটার

আবিরা আফরোজ মুনা

নক্ষত্রে বিস্ফোরণের ফলে ব্ল্যাক হোলের জন্ম হয়। কিন্তু নক্ষত্রটি যদি অতো বড় না হয় (সূর্যের ১.৪ গুণ বড়) তবে সেই বিস্ফোরণের ফলে নিউট্রন স্টারের জন্ম হয়। পরমাণুর গঠন থেকে আমরা জানি যে একটি পরমাণুর বেশির ভাগ ভরই এক কেন্দ্রে রয়েছে। একইভাবে যখন একটা বৃহদাকৃতির মৃতপ্রায় নক্ষত্রের বিস্ফোরণ হয় তখন এর বাইরের অংশ বিস্ফোরিত হয়ে শুধুমাত্র কেন্দ্র বা কোর অবশিষ্ট থাকে। পরমাণুর সাথে এর পার্থক্য হল এই যে, নিউট্রন স্টারের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকে শুধুমাত্র নিউট্রন। যে কারণে এর ওজন হয় অস্বাভাবিক বেশি। প্রায় ১০ মাইল দীর্ঘ যা কিনা নক্ষত্রের তুলনায় ছোট এক বিন্দু। এক-চামচ নিউট্রন স্টারের ওজন দাঁড়ায় প্রায় ১০ মিলিয়ন টন। বোঝাই যাচ্ছে যে , এই নিউট্রন স্টারের নিউট্রন গুলো কত ঘনভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে। তাদের মাঝে দূরত্ব থাকে নগণ্য।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, একসময় নিউট্রনগুলো এই ভর কেন্দ্রীভূত করে রাখতে পারবেনা। যে স্ট্রাকচারটা এই পুরো নিউট্রন স্টারকে ধরে রেখেছে সেটা ভেঙ্গে যাবে। এতে করে গঠিত হবে কোয়ার্ক স্টার। কোয়ার্ক স্টার, নিউট্রন স্টারের থেকে আকারে ছোট কিন্তু অনেক বেশি ঘন। এর ভেতরকার প্রেশার বাড়তে থাকলে এর কোরে “স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক” এর আবির্ভাব হবে।এরা সাধারণ কোয়ার্কের মতন আচরণ করে না। যদি এই স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কের সংখ্যা অনেক বেশি হয় তবে এরা স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার তৈরি করে। যেমন, যদি কোন লোহার টুকরোকে অস্বাভাবিক বেশি প্রেশার দেওয়া হয় , তবে অচিরেই এই লোহার টুকরোর পরমাণুর নিউট্রন,প্রোটন বিস্ফোরিত হয়ে কোয়ার্কে পরিণত হবে। আরও বেশি প্রেশারের পরিমাণ বাড়ালে কিছু কোয়ার্কের ওজন বেড়ে গিয়ে স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কে পরিণত হবে। এরফলে লোহার টুকরোটা আগের অবস্থায় না থেকে স্ট্রেঞ্জলেট (Strangelet) এ পরিণত হবে। যা কিনা স্ট্রেঞ্জ ম্যাটারের ক্ষুদ্র একটি অংশ।

স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার অন্যান্য পদার্থের তুলনায় অনন্য। এটি আমাদের পরিচিত ম্যাটারের তুলনায় অনেক বেশী ভারী। এছাড়াও আমাদের পরিচিত ম্যাটারের গঠন বেশ গোছানো এবং অনুমেয়। কিন্তু স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার ঠিক এর উল্টোটা। স্ট্রেঞ্জ ম্যাটারের কোয়ার্কগুলোর কোনও সীমা নেই। তারা ইচ্ছামতন ছুটে বেড়ায়। এতো বিশৃঙ্খলার পরেও স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার স্থিতিশীল, অনেক ঘন অবস্থায় থাকতে পারে। কিন্তু এই স্থিতিশীলতাই বিপদজনক। স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার মহাবিশ্বের যেকোনো জায়গায় স্থিতি বজায় রাখতে পারবে। এমনকি নিউট্রন স্টারের বাইরেও এমন স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারবে। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার ছড়িয়ে পড়তে পারে। যদি কোনও স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার এরকম ঘুরে বেরায় তবে আশেপাশের সব কিছুকে গ্রাস করে নিতে পারে, এমনকি গোটা মহাবিশ্বকেও। এটা যাকেই স্পর্শ করবে তা স্ট্রেঞ্জ ম্যাটারে পরিণত হবে।

পৃথিবী হতে কয়েক হাজার আলোকবর্ষ দূরে নিউট্রন স্টার অবস্থিত। যদি দুটো নিউট্রন স্টার একে অপরের সাথে ধাক্কা খায় কিংবা একটি নিউট্রন স্টারর কোনও ব্ল্যাক হোলের উপর আছড়ে পরে তবেই স্ট্রেঞ্জলেট গুলো ছাড়া পাবে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ানোর জন্য। তখন এই স্ট্রেঞ্জলেট গুলো প্রচন্ড বেগে ছুটে আসতে থাকবে। যতক্ষণ না তাদের গতিপথে গ্রাস করে নেওয়ার মতো কিছু পড়ছে ততক্ষণ তারা কয়েক বিলিয়ন বছর এভাবে বিনা বাধায় ছুটে চলতে পারবে। স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার সামনে যা-ই পাবে তাকেই গ্রাস করে নেবে। হোক সেটা কোনও জড় পদার্থ কিংবা পৃথিবী। এবং সবকিছুকে স্ট্রেঞ্জ ম্যাটারে পরিণত করবে।তবে স্ট্রেঞ্জ ম্যাটাররের হাত থেকে বাঁচার উপায়!!

স্ট্রেঞ্জ ম্যাটারকে রুখে দেওয়ার জন্য একটা উপায় আছে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা অসম্ভব। স্ট্রেঞ্জ ম্যাটারকে ব্ল্যাক হোলে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু যা দিয়ে স্ট্রেঞ্জ ম্যাটারকে ছুড়ে ফেলবো, সেটাও তো নিমিষে স্ট্রেঞ্জ ম্যাটারে পরিণত হবে। আরেকটা কিন্তু হচ্ছে ব্ল্যাক হোলের কাছে পৌছাবে কিভাবে? যেখানে ব্ল্যাক হোল আলোকেও আটকে ফেলে, বের হতে পারে না এর অত্যাধিক গ্রাভিটেশনাল ফোর্সের কারণে।

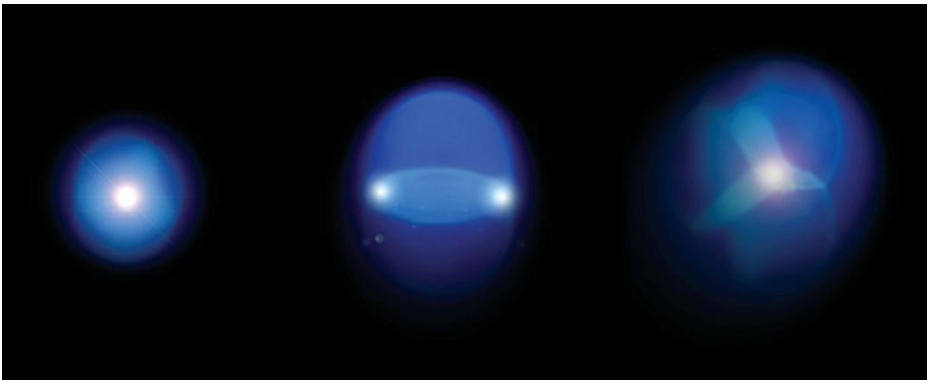

স্ট্রেঞ্জ ম্যাটারের অস্তিত্ব তাত্ত্বিকভাবে থাকলেও, এখনো বাস্তবে এর দেখা মেলেনি। পদার্থবিদেরা পার্টিকেল এক্সেলেটরের মাধ্যমে স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছেন। পরবর্তীতে তারা সিদ্ধান্তে এলেন যে, পার্টিকেল এক্সেলেটর স্ট্রেঞ্জলেটের সংস্পর্শে এলে অত্যধিক গরম হয়ে যাবে , যাতে আর স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার তৈরি করা সম্ভব নয়। যদি কোনভাবে স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার ল্যাবে তৈরি করা যায়-ও তবু তা পজিটিভ চার্জে থাকবে এবং শুধুমাত্র কাছের ইলেকট্রনগুলোকেই আকর্ষণ করবে। এধরণের স্ট্রেঞ্জলেট আমাদের জন্য হুমকির নয়। এছাড়াও আশার কথা এই যে, পৃথীবীর জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত কোনও স্ট্রেঞ্জ ম্যাটার পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসেনি। তাই এর অদূর সম্ভাবনা একদম নেই বললেই চলে।

সারোস চক্র ও গ্রহণের ভবিষ্যতবাণী

মোঃ আক্তারুজ্জামান (SWAN)

বহুকাল আগে থেকেই আমাদের মনে জায়গা করে নিয়েছে বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনাবলি। এর মধ্যে সূর্যগ্রহন ও চন্দ্রগ্রহন অন্যতম। প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদরা একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন। তারা খেয়াল করেছিলেন প্রতি ১৮ বছর ১০ দিনে একবার করে গ্রহন হয়। এই ১৮ বছর ১০ দিনকে বলা হয় একটি সারোস চক্র। এই সারোস চক্রটি কি? কিইবা এর পেছনের বিজ্ঞান?

বিষয়টি জানার আগে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানা দরকার। আমাদের চাদের কক্ষপথের সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের সমতল নয়। প্রায় ৫ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করে চাদের কক্ষপথ। আর এ দুটি কক্ষপথের ছেদবিন্দুকে বলা হয় node. যখন চাঁদ এই নোড অবস্থানে আসে এবং পৃথিবী যদি সূর্য ও চাদের মাঝখানে তখন থাকে, তাহলেই গ্রহন সম্ভব (চন্দ্রগ্রহন)।যদি কক্ষপথের কোণ করে না থাকতো, তাহলে প্রতি মাসেই আমরা গ্রহন দেখতে পেতাম।

১.সাইনোডিক মাসঃ চাদের একটি পূর্ণ চক্র সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে, তাকে বলা হয় এক সাইনোডিক মাস। এর দৈর্ঘ্য ২৯.৫৩০৬ দিন।

২.ড্রাকোনিক মাসঃ চাঁদ তার কক্ষপথে একই নোডে ফিরে আসতে যত সময় লাগে, সেটি হলো ড্রাকোনিক মাস। এর দৈর্ঘ্য ২৭.২১২২ দিন।

এছাড়া আরও তিনটি মাস আছে, তবে সেগুলো এ আলোচনায় দরকার নেই।

এবার একটি জিনিস ভাবতে হবে। প্রথমেই বলেছি চাঁদ যখন নোডে অবস্থান করে তখনই কেবল গ্রহন হয়। যেহেতু সাইনোডিক মাসে চাঁদ একটি পূর্ণ চক্র সম্পন্ন করে এবং ড্রাকোনিক

মাসে আবার তার নোডে ফিরে আসে, তাই, এ মাস দুটি যখন মিলে যাবে তখনই গ্রহন হবে। অর্থাৎ মনে করুন, আজকে চন্দ্রগ্রহন হলো। এর পরবর্তী চন্দ্রগ্রহন তখনই হবে যখন ড্রাকোনিক মাস ও সাইনোডিক মাস এর পূর্ণসংখ্যা মিলে যাবে।

অর্থাৎ যখন ২৯.৫৩০৬ x =২৭.২১২২ y হবে তখনই গ্রহন হবে

সমাধান করে সবচেয়ে নিখুত যে মানটি পাওয়া যায়, তা হলো x=223 এবং y=242.অর্থাৎ ২২৩ সাইনোডিক মাস পরে অথবা ২৪২ ড্রাকোনিক মাস পরে আবারও গ্রহন হবে। এখন ২২৩ সাইনোডিক মাস বা ২৪২ ড্রাকোনিক মাস=১৮ বছর ১০ দিন ৮ ঘন্টা (প্রায়)। এটিই সারোস চক্রের সময়। অর্থাৎ একটি গ্রহনের ১৮ বছর ১০ দিন ৮ ঘন্টা পর আবার গ্রহন হবে।

সারোস চক্র সূর্যগ্রহন বা চন্দ্রগ্রহন উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। তবে এই চক্রটি শুধুমাত্র গ্রহনের সময় বলতে পারে। কিন্তু গ্রহনটি কোথায় হবে সেটি বলা যায়না। যেমন, আজকে যদি বাংলাদেশে গ্রহন হয়, তাহলে ১৮ বছর ১০ দিন ৮ ঘন্টা পরে গ্রহন হবে কিন্তু সেটি বাংলাদেশ থেকে দেখা যাবেনা। কোথায় দেখা যাবে সে আলোচনা অন্য কোন দিন করব।

যাই হোক এই ছিল সারোস চক্রের মাধ্যমে গ্রহনের ভবিষ্যৎবাণীর প্রক্রিয়া।

বামন গ্রহ

শাহরিন উৎসব

বামন গ্রহ মহাকাশীয় এমন বস্তু যা একটি গ্রহের মত কিন্তু গ্রহ হওয়ার উপযুক্ত শর্তগুলো পূরন করেনা।এমনকি তারা কোনো উপগ্রহও নয়,কেননা এটির নিজস্ব নক্ষত্রকে আর্বতন করার মত একটি কক্ষপথ থাকে।

বামনগ্রহের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। এই যেমন:

১। নক্ষত্রকে ঘিরে আর্বতন

২। মোটামুটি গোলাকার

৩।এদের নিকটে কমেট, এস্ট্রোরয়েডসহ অন্যান্য বামন গ্রহ থাকে।

বামন গ্রহের সাথে গ্রহের প্রধান পার্থক্য হয় মাধ্যাকর্ষন শক্তিতে।বামন গ্রহগুলোর ম্যাস গ্রহের তুলানায় কম বিধায় মাধ্যাকর্ষন শক্তিও কম থাকে। এখনো পর্যন্ত সনাক্তকৃত বামন গ্রহগুলো চাঁদ অপেক্ষা ছোট। IAU (International Astronomical Union) আমাদের সোলার সিস্টেমে পাঁচটি বামন গ্রহ শনাক্ত করেছেন।

1. Pluto
2. Eris
3. Cerus
4. Makemake
5. Haumea

1. Pluto: আঁকারে সর্ববৃহৎ এবং ভরের দিক থেকে দ্বিতীয়, প্লুটো নামক বামন গ্রহটি ১৯৩০ সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হলে এটিকে সোলার মডেলের নবম গ্রহ হিসেবে অ্যাখায়িত করা হয়। কিন্তু ১৯৯০ সালে গ্রহ খেতাবধারী প্লুটোর গ্রহের শর্তানুরুপ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে ২০০৬ সালে এটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুনঃশ্রেনীকরন করে বামন গ্রহ করা হয়। বিজ্ঞানীরা প্লুটোর সমতলে এবং পাহাড়গুলোতে নাইট্রোজেন ও পানির তৈরি বরফের সন্ধান পেয়েছেন। এটির পাঁচটি চাঁদ রয়েছে। Charon নামক চাঁদটি এর হোস্ট প্লুটোর অর্ধেকের সমান। এই প্লুটো ২৫০ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিন করে

2. Eris: গ্রিকদেবী Eris এর নাম থেকে এই গ্রহের নামকরন করা হয়। এটির আকার প্লুটোর চেয়ে সামান্য ছোট কিন্তু ভরের দিক থেকে প্লুটো অপেক্ষা বেশি। এটি আমাদের পৃথিবী থেকে বেশ দূরে। তবে বিজ্ঞানীরা সেখানে মিথেনের বরফের সন্ধান পেয়েছেন।

3. Haumea: সূর্য থেকে তৃতীয় নিকটতম বামন গ্রহ। এটি অন্যদের মতো গোলাকার নয়। এটি উপবৃত্তাকার। Haumea তে 3.9 ঘন্টায় একদিন হয়। এটির অত্যন্ত দ্রুত ঘূর্ননই এর উপবৃত্তাকার আকারের সৃষ্টি করে বলে মনে করা হয়। ২০০৯ সালে বিজ্ঞানীরা এতে গাঢ় স্পট খুজে পেয়েছেন। যার চারপাশে বরফের স্ফটিক বেরিয়ে আছে। এখানে খনিজ ও কার্বনসমৃদ্ধ যৌগগুলো উচ্চ ঘনত্বে আছে বলে মনে করা হয়।

4.Cerus: এষ্ট্রোরয়েড বেল্ট(মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যবর্তী গ্রহানু বেল্ট)অবস্থিত। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যবর্তী স্থানে গ্রহানু থাকার সম্ভাবনা হতেই ১৮০১ সালে Giuseppe piazzi এটি আবিষ্কার করেন। আপনি যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন, এর পৃষ্ঠে আলোক বিন্দুর ন্যায় উজ্জল পৃষ্ঠ দেখতে পাবেন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ঊজ্জ্বল অঞ্চলগুলোর বেশিরভাগ জমাট সোডিয়াম কার্বনেট সেগুলো সম্ভবত তরল অবস্থা থেকে পতিত হয়ে পৃষ্ঠে জমা হয়েছে এবং বাষ্পীভবন ঘটার ফলে অত্যন্ত প্রতিফলিত লবনের আস্তরন অবশিষ্ট রেখেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত হতে পারেননি।

5. Makemake: সোলার সিস্টেমের তৃতীয় বৃহত্তম বামনগ্রহ এই Makemake। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে IAU এটিকে বামন গ্রহ হিসেবে অ্যাখায়িত করে। এই কুইপার বেল্টে সৌরজগতের বাইরে এমন একটি অঞ্চল যা 20AU জুড়ে প্রসারিত বা বিস্তৃত। এটির বায়ুমন্ডল মিথেন এবং নাইট্রোজেন ভিত্তিক হতে পারে বলে মনে করা হয়।

আরও বেশ কয়েকটিকে এই তালিকায় অন্তভুক্ত করা হবে কিনা তা বিবেচনায় রাখা হয়েছে বিজ্ঞানীরা হিসাব -নিকাশ কষে জানিয়েছেন আমাদের সোলার সিস্টেমে শতাধিক এমনকি হাজারটার মতো বামন গ্রহ থাকতে পারে।

ঝিনুক থেকে মুক্তা তৈরি হয় কিভাবে?

আবিরা আফরোজ

মুক্তা সবার কাছেই অতি আকর্ষণীয় ও মোহনীয় বস্তু; যা কিনা তৈরি হয় ঝিনুকে। আজ এর তৈরির প্রক্রিয়া জানা যাক।

ঝিনুক মলাস্কা (Mollusca) পর্বের অন্তর্গত একপ্রকারের প্রাণি। মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের মধ্যে *Pinctada* গণের ঝিনুক উল্লেখযোগ্য। এদেরকে Pearl Oyster বলা হয়। তাছাড়া অন্যান্য কিছু মলাস্ক থেকেও মুক্তা তৈরি হয়।

ঝিনুকের খোলসে যথাক্রমে Periostracum, Prismatic ও Nacreous নামের তিনটি প্রধান স্তর থাকে যার সবচেয়ে ভেতরের স্তরটির নাম Nacreous।এখান থেকে মুক্তা তৈরির উপাদান Nacre নিঃসৃত হয়; যা কিনা ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও কংক্রিওলিন নামের প্রোটিন দিয়ে তৈরি। তাই স্তরটিকে "Mother of Pearl" বলা হয়। ঝিনুকের দেহে ম্যান্টল টিস্যু (Mantle tissue) নামের একপ্রকারের বিশেষ টিস্যু থাকে। এই ম্যান্টল টিস্যুতে যখন কোন বাহ্যিক বস্তুকণা, ক্ষুদ্র প্রাণি বা অণুজীব প্রবেশ করে তখন এরা অনুপ্রবেশকারীকে পরজীবী হিসেবে ধরে নেয় এবং শারীরিক প্রতিরক্ষার অংশ হিসেবে বস্তুটিকে ঘিরে Pearl sac তৈরি করে। এই Pearl sac এ তারা Nacre নির্গত করে । এই আবরণটি ম্যান্টল টিস্যুতে প্রবেশকৃত কণাটিকে সম্পূর্ণ আবৃত করে ফেলে ধীরে ধীরে। এভাবেই প্রবেশকৃত কণাটিকে ঘিরে তৈরি হয় মুক্তা।

বর্ণচোরা

শাহরিন উৎসব

বর্ণচোরা হিসেবে খ্যাতি প্রাপ্ত গিরগিটি *ecthotherm* প্রানীগুলোর একটি যারা নিজেদের দৈহিক তাপ নিয়ন্ত্রনের জন্য বর্ণ পরিবর্তন করে থাকে।

গিরগিটির দৈহিক গঠন

এই প্রানীদের দেহ ত্বকের অভ্যন্তরে তিনটি স্তর রয়েছে, যেটির প্রতিটি স্তরেই রয়েছে একেক রকমের ক্রোমাটোফোর বা রঞ্জক গ্রন্থি। সবচেয়ে বাইরের স্তর হলো *Xanthrophore*। যেটি লাল (Erythrocyte) ও হলুদ (Xanthocyte) বর্নের জন্য দায়ী। মাঝের স্তরটি হলো ইরিডোফোর (Iridophore), নীল রঙের জন্য দায়ী। একে Guanophores ও বলে। এই গ্রন্থিতে বর্ণহীন guanine crystal থাকে, এগুলির মধ্যেই আলো প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়ে নীল দেখায়। সর্বশেষের স্তরটিকে বলা হয় melanophore, এ স্তরে থাকে কালো রঙের রঞ্জক পদার্থ নিঃসরনকারী melanosome.

কেমন ভাবে হয় এই রঙ পরিবর্তনের খেলা?

প্রথমদিকে মনে করা হত বিশেষ এই প্রানীটির চামড়ার নিচে রয়েছে রঞ্জক পদার্থ মেশানো কোষের স্তর, যেটির কারনে তাদের চামড়ার রঙ হতে পারে হালকা কিংবা গাড়। সাম্প্রতিক

কালের গবেষণা থেকে জানা গেছে, Iridosphore এ ন্যানো পার্টিকেল থাকে যেগুলো রঙ বদলানোর পেছনের আসল চাবিকাঠি। *নেচার কমিউনিকেশন* জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা অনুসারে, শরীরের ঐ সকল স্ফটিকগুলো বিভিন্ন তরঙ্গদৈঘ্যের আলোর প্রতিফলন ঘটাতে থাকে। গবেষনার অন্যতম লেখক মিলিনকোভিচ জানান,

কিছু নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈঘ্যের আলোই কেবল স্ফটিকগুলো প্রতিফলিত করে থাকে, বাকিগুলো নয়। স্ফটিকের আকার আর তাদের অবস্থানের ভিন্নতার কারনে রঙের মাঝেও ভিন্নতার সৃষ্টি হয়।

গিরগিটির কোষগুলো যখন উত্তেজিত অবস্থায় থাকে তখন Iridopore কোষগুলো রিথ্রোফোরকে (লাল রঙের জন্য দায়ী) সম্পূর্নরূপে প্রসারিত করে এবং অন্যান্য রঞ্জক পদার্থের নিঃসরণ বাধা প্রাপ্ত হয়ে লাল বর্ন ধারণ করে। অপরদিকে গিরগিটি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে এরিথ্রোফোর (লাল রঙের জন্য দায়ী) কে সংকুচিত করে এবং ইরিডোফোরের সাহায্য নীল এবং জান্হফিলের মাধ্যমে হলুদ বর্নের মিশ্রনে সবুজ বর্ন সৃষ্টি করে।

কেন এই ক্যামোফ্লাজ?

রঙ পরিবর্তন করতে পারার ধর্ম থাকায় গিরগিটিকে ক্যামোফ্লাজ বলে। গিরগিটি নিয়ে একটা ভুল ধারণা পরিলক্ষিত হয়। এটি নাকি তার পরিবেশের রঙের সাথে তাল মিলিয়ে গা ঢাকা দেবার জন্য ক্যামোফ্লাজ করে।

মূলত, গিরগিটি নিজের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন, আবেগের বহিঃপ্রকাশ এবং অপর আরেকটি গিরগিটির সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ক্যামোফ্লেজ করে। গিরগিটির ক্ষমতা নেই পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে স্বয়ংস্ক্রিয়ভাবে নিজের শরীরের তাপমাত্রা পরিবর্তনের। তাইতো তার অভিযোজিত হওয়ার বিশেষ এই কৌশল। উষ্ণ প্রধান অঞ্চলে অথবা গরমকালে গিরগিটি হালকা বর্ন ধারণ করে। যার ফলে তাপ প্রতিফলিত করে দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।আবার শীতকালে এই প্রানীটি গাঢ় বাদামী বা খয়েরি বর্ন ধারণ করে যা অতিরিক্ত সূর্যালোক শোষণ করে নেয়। গিরগিটিদের চামড়ায় কিছু রিসেপ্টর থাকে যারা বাইরের তাপমাত্রা অনুভব করে এমন কিছু neuronal বা hormonal signal বা স্টিমুলেশনকে Central Nervous Syestem কে পাঠায়, যেখান থেকে রং পরিবর্তনের সংকেত আসে, যার বহি প্রকাশ এই ক্যামোফ্লাজ।

তাই, বেচারা প্রানীটিকে বর্ণচোরা বললে তার এই বিশেষ ক্ষমতার অবমাননাই হবে।

টাইটানের কক্ষচ্যুতি

মোঃ আক্তারুজ্জামান (SWAN)

অত্যন্ত সুন্দর দেখতে গ্রহ শনির চাঁদ সংখ্যা ৮২ টি। এর মধ্যে নজর কাড়া উপগ্রহটির নাম টাইটান। এটি অনন্য একটি উপগ্রহ। এতে থাকতে পারে প্রাণ উপযোগী বায়ুমন্ডল, নদী অথবা হ্রদ। টাইটান প্রায় ৭৫৯০০০ মিলিয়ন মাইল দূর থেকে শনি গ্রহকে প্রদক্ষিন করে। কিন্তু একটি বিষয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাড়িয়েছে।

আমাদের পৃথিবীতে উপগ্রহ একটিই। চাঁদ ও পৃথিবী উভয়ই উভয়কেই সমান বলে আকর্ষন করে। পৃথিবীর ভর বেশি হওয়ায় সৃষ্ট ত্বরন কম হয় কিন্তু চাদের ক্ষেত্রে সৃষ্ট কেন্দ্রমুখি ত্বরণ ই পৃথিবীর চারদিকে চাদকে ঘোরাতে বাধ্য করে। কিন্তু চাদের যে আকর্ষন থাকে তার প্রভাবে জোয়ার ভাটায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। জোয়ার ভাটার কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠে সৃষ্ট ঘর্ষণ বলের ফলশ্রুতিতে পৃথিবী কক্ষ হতে সামান্যতম বিচ্যুত হয়। ফলে বিচ্যুতি ঘটে চাদের। এই পরিমানটি বছরে 1.5 inch. কিন্তু শনি গ্রহে পানি নেই, জোয়ার ভাটার প্রশ্নই আসেনা। কিন্তু শনি গ্রহে আছে গ্যাসের স্তর। উপগ্রহগুলোর প্রভাবে এই গ্যাসস্তরে সৃষ্ট ঘর্ষণ এর মান পৃথিবীর তুলনায় অবশ্যই কম হবে। তাই শনি গ্রহের তুলনামূলক বিচ্যুতি কম হবে। এ হিসাব করে বের করা হয়েছিল টাইটানের বছরে বিচ্যুতির পরিমান 0.4 inch. কিন্তু পর্যবেক্ষনে দেখা যায় এ পরিমাণ 4 inch. যা হিসাবকৃত মানের প্রায় 10 গুন। কেন এমনটি হলো?

Astrometry এবং Radiometry পদ্ধতি ব্যবহার এবং পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে যে ব্যাখায় আসা হয়েছে তা ছিলো এমন: শনির উপগ্রহ সমূহ শনিগ্রহে ঘর্ষন সৃষ্টির পাশাপাশি শনি গ্রহের কক্ষপথে গ্রহটির কম্পন সৃষ্টি করে। এর ফলে টাইটানের উপর শনিগ্রহের টান বিশ্লেষণ করে

দেখা যায়, এই কম্পনই কক্ষপথের হতে টাইটানকে বেশি পরিমান বিচ্যুত করে। এটিই টাইটানের বেশি পরিমানে কক্ষচ্যুত হওয়ার কারণ।

ক্লাউন ফিশ

শাকির আহমেদ

Nemo তো সবাই দেখেছ। Nemo হলো common clown fish। প্রথমে আমি ডাইরিতে কি লিখেছি তাই শেয়ার করছি।

"সামুদ্রিক এলিমনির 10 প্রজাতি আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের গায়ের কাটায় বিষ ব্যবহার করে। তবে শিকারিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ক্লাউনফিশ স্থায়ী জোড়া হিসাবে এই বিষাক্ত বাসস্থানে থাকে। তারা এক ধরনের ওভারকোট পরে বলে বিষ থেকে রক্ষা পায়। ক্লাউনফিশ 30 প্রজাতির হয়ে থাকে। ক্লাউনফিশ একইসাথে ছেলে ও মেয়ে হতে পারে। ক্লাউনফিশ জোড়া থেকে মেয়ে মারা গেলে ছেলে লিঙ্গ বদলিয়ে মেয়ে হয়ে যায়। আর নতুন পুরুষের খোঁজ করে। ক্রান্তি নানা রঙের হয়ে থাকে।"

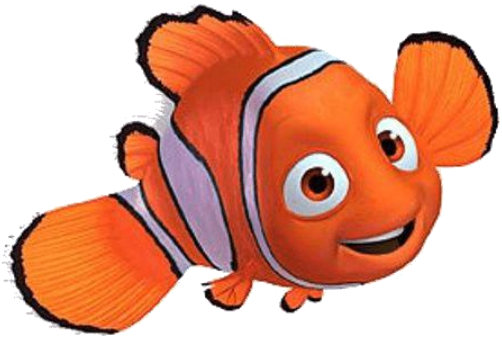

একটু আলোচনা:

প্রথমত এটা এলি মনি না এটা এনিমন/এনিমনি/anemone/ সাগর কুসুম । যখন এটা ডাইরিতে লিখেছিলাম তখন ভাবতাম anemone এক ধরনের সামুদ্রিক শৈবাল তবে আসলে তারা প্রাণিজগতের অংশ। এনিমন হলো নিডারিয়া পর্বের প্রাণী। এদের টেন্টিকেল এ বিষ বহনকারী নিডোসাইট নামের কোষ থাকে। Anemone ও ক্লাউনফিশ এর সম্পর্কটা বিশেষ বন্ধুত্বের। একসাথে খাওয়া একসাথে থাকা এক সাথেই তাদের বাস । এভাবে একে অন্যকে সহায়তার মাধ্যমে যে সম্পর্ক তাকে মিউচুয়ালিজম বল।

Anemone কিভাবে অন্যকে সাহায্য করে:

1। Anemone এর বিষ ক্লাউনফিশ দের অন্যান্য শিকারিদের হাত থেকে রক্ষা করে।

2। Anemone এর খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ক্লাউনফিশ খানা হয়।

ক্লাউনফিশ কিভাবে সাহায্য করে:

1। এর বিষ্ঠা Anemone দের পুষ্টি জোগায়।

2। এরা ক্ষুদ্র প্রাণী ও প্যারাসাইট গ্রহণ করে এবং Anemone দের সুরক্ষা দেয়।

3। ক্লাউনফিশ উচ্চ পিচের শব্দ নিঃসরণ করে যা বাটারফ্লাই ফিসদের দূরে রাখে, এরা এনিমনদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

উপরের একটি তথ্য কে একটু সংশোধন করতে হবে। এনিমন এর প্রজাতি সংখ্যা এক হাজারের বেশি তবে শুধু 10 টি প্রজাতি ক্লাউনফিশ দের আবাস দেয়। ক্লাউন ফিশ দের Anemone fish ও বলে।

ক্লাউনফিশ জনন: এদের মধ্যে Protandrous sequential hermaphroditism দেখা যায়। এখানে hermaphroditism হলো উভলিঙ্গীতা । sequential হলো একই সময়ে ছেলে বা মেয়ে না, বরং যখন ছেলে তখন সম্পুর্ন ছেলে এবং যখন মেয়ে তখন সম্পুর্ন মেয়ে। Protandrous হলো জীবনের প্রথম পর্যায়ে পুরুষ এবং পরবর্তী পর্যায়ে নারীর ভূমিকা।

ক্লাউনফিশ পরিবারের ছোট clownfish শুক্রাশয় আর ডিম্বাশয় দুইটাই থাকে । প্রথমে পরিপক্ব হয় শুক্রাশয় আর ডিম্বাশয় অপরিপক্ব অবস্থায় থাকে। যেই clownfish টি সবচেয়ে বড় তার ডিম্বসয় পরিপক্ব হয় আর শুক্রাশয় এর কোষ বিনষ্ট হয়। আর পরের বড় মাছটি জননে অংশ নেওয়া পুরুষের ভূমিকায় থাকে। পরিবারের ক্ষমতা থাকে আকারের ভিত্তিতে। অর্থাৎ যে সবচেয়ে বড় মনে নারীই পরিবার প্রধান। নারী মরলে পরের বড় পুরুষ জেন্ডার চেঞ্জ করে।

লেখায় লুকুচুরি:ক্রিপ্টোগ্রাফির হাতেখড়ি

নাবিদ হাসান

ধরো, তুমি স্কুলের একটা বেঞ্চে বসে আছো। বেঞ্চে মোট ৩ জন যথাক্রমে তুমি, রিপন এবং তোমার প্রিয় বন্ধু অন্তর বসে আছো। এখন তুমি অন্তরের কাছে কোনো তথ্য পাঠাতে চাও যা তুমি রিপনকে জানাতে চাও না। এ ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে? মুখে মুখে তো বলা যাবেই না কারণ এতে রিপন শুনে ফেলবে। চিরকুট পাঠানো একটা ভালো বুদ্ধি। কিন্তু চিরিকুট তো রিপন পড়ে ফেলতে পারবে। এ ক্ষেত্রে আমরা চিঠিকে এমনভাবে লিখতে পারি যে তা সাধারণ ভাবে দেখলে মনে হবে তার কোনো অর্থ নেই, তবে এমন একটা বিশেষ পূর্ব-নির্ধারিত পদ্ধতি যা আমি এবং আমার প্রিয় বন্ধু অন্তর ছাড়া কেউ জানে না তা ব্যবহার করে ঐ অর্থহীন লেখাগুলোর প্রকৃত অর্থ জানা যাবে। এই এখনই আমি যে কাজটি করলাম তাকেই কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা তথ্য গুপ্তিকরন বিদ্যা বা ক্রিপ্টোগ্রাফি (Cryptography) বলে।

CAESAR CIPHER

আমরা আজকে ক্রিপ্টোগ্রাফির একটি প্রাচীন ও সহজ উদাহরণ Caesar Cipher নিয়ে আলোচনা করব। Caesar Cipher এর মূল কথাই হচ্ছে Shift বা অবস্থান পরিবর্তন। Caesar Cipher এ একটি স্ট্রিং এর প্রতিটি অক্ষরকে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা অনুযায়ী Shift করা হয়। Shift করার পুর্বে স্ট্রিংকে বলে Plain text আর Shift করার পর তাকে বলে Cipher text, অন্যদিকে যে নির্দিষ্ট সংখ্যা অনুযায়ী Shift করা হয় তাকে Shift value বলে। গাণিতিক ভাবে Caesar Cipher এর Encryption কে লেখা যায়, E_n =(x+n) mod 26 আকারে আবার Decryption কে লেখা যায়, D_n =(x-n) mod 26 আকারে যেখানে x হচ্ছে কোনো অক্ষর ইংরেজি বর্ণমালার কততম তা এবং n হচ্ছে Shift value বা কত ঘর shift করা হয়েছে তার মান।

একটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে, ধরো তুমি যে তথ্যটি পাঠাতে চাও তা হচ্ছে, “CALL ME”। এখন তুমি এই “CALL ME” স্ট্রিং এর প্রতিটি অক্ষরকে ১ ঘর এগিয়ে দিলে পাবে “DBMM NF”, এর মাধ্যমেই তুমি করে ফেললে Caesar Cipher এর Encryption। অর্থাৎ “CALL ME” হচ্ছে Plain text, “DBMM NF” হচ্ছে Cipher text আর ১ হচ্ছে Shift value। এখন দেখ তো কোনো সাধারণ মানুষ Cipher text টি দেখলে কি তার আসল অর্থ বুঝতে পারবে? না পারবে না যতক্ষণ না তিনি Shift value জানতে পারবেন (ব্যতিক্রম বিদ্যমান, Caesar Cipher এর দুর্বলতা দেখ)। এখানে একটা জিনিস কিন্তু গুরুত্বপুর্ণ সেটা হচ্ছে প্রেরক আর প্রাপক উভয়কেই Shift value জানতে হবে। আমরা এইটুকু জ্ঞান থেকে চাইলে Caesar Cipher এর জন্য একটা Python script লিখতে পারি।

```python
#In the name of Allah.

"""
@ Nabid Hasan
Contact me:
    • fb.com/nabid.04
    • nabid72019@gmail.com
"""

"""
The given strings' alphabetical characters are shifted according to t
"""


lower_case="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
upper_case="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"


def encrypt(s,k):
    output=""
    for i in s:
        try:
            output+=lower_case[(lower_case.index(i)+k)%26]
        except ValueError:
            try:
                output+=upper_case[(upper_case.index(i)+k)%26]
            except ValueError:
                output+=i
                continue
    return output
```

```python
def decrypt(s,k):
    output=""
    for i in s:
        try:
            output+=lower_case[(lower_case.index(i)-k)%26]
        except ValueError:
            try:
                output+=upper_case[(upper_case.index(i)-k)%26]
            except ValueError:
                output+=i
                continue
    return output


def main():
    plain_text=str(input("Input string text:"))
    shift_value=int(input("Input shift value:"))
    op=input("To encrypt input 'e'. To decrypt input 'd':")
    if op=='e' or op=='e ' or op==' e' or op==' e ':
        print('Encrypted text: '+encrypt(plain_text,shift_value))
    else:
        print('Decrypted text: '+decrypt(plain_text,shift_value))


if __name__=="__main__":
    main()
```

CAESAR CIPHER এর দুর্বলতা

Caesar Cipher এর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে যেহেতু Shift value মাত্র ২৬ টি হতে পারে তাই Brute force এর মাধ্যমে খুব সহজেই আমরা Plain text পেতে পারি। আবার আরেকটি দুর্বলতা হচ্ছে Frequency analysis বা বর্ণ ব্যবহারের প্রবণতা তোমরা যদি ভালো ভাবে ইংরেজী ভাষাকে পর্যবেক্ষণ কর তবে দেখবে যে ইংরেজী ভাষায় "E" এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি, তো এখন তোমাকে যদি তোমাকে যথেষ্ট বড় Cipher text দেয়া হয় তবে

তুমি ঐ Cipher text এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অক্ষর খোজার মাধ্যমে Shift value পেতে পারো। ধরো Cipher text এ "H" এই আক্ষরটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তাহলে অণুমান করা যায় যে Shift value, "H"-"E"=8-5=3 যদিও এটি তখনই সত্যি হবে যখন তোমাকে যথেষ্ট বড় Cipher text দেওয়া হবে। Brute force এর জন্য নিচে একটি Python script দেওয়া হলো,

```python
#In the name of Allah.

"""
© Nabid Hasan
Contact me:
    • fb.com/nabid.04
    • nabid72019@gmail.com
"""

lower_case="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
upper_case="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"


def decrypt(s,k):
    output=""
    for i in s:
        try:
            output+=lower_case[(lower_case.index(i)-k)%26]
        except ValueError:
            try:
                output+=upper_case[(upper_case.index(i)-k)%26]
            except ValueError:
                output+=i
                continue
    return output

def main():
    cipher_text=str(input("Input cipher text:"))
    for i in range(1,26):
        print("If the shift value is",i,":",decrypt(cipher_text,i))

if __name__=="__main__":
    main()
```

ইলেকট্রোজেনিক মাছগুলোর বিস্ময়কর ক্ষমতা

শাহরিন উৎসব

প্রকৃতি সত্যিই খুব বিচিত্র। যে ইলেকট্রিসিটি জীবকে তড়িতাহত করে মেরে ফেলবার জন্য যথেষ্ঠ সেরকম কোনো জীব নিজেই কিনা তা উৎপাদন করে। ইলেক্ট্রোজেনিক মাছ গুলোও তেমনি। যে মাছ নিজস্ব বিদ্যুতক্ষেত্র তৈরি করতে পারে সেই মাছগুলোকে ইলেকট্রোজেনিক ফিস বলে। ইলেকট্রিক মাছগুলো মাত্রই ইলেকট্রোরিসেপটিভ অর্থ্যাৎ তড়িৎক্ষেত্রের উপস্থিতি শনাক্ত করতে পারে। উল্লেখ্য, সব ইলেকট্রিক ফিস ইল্কেট্রোরিসেপটিভ হলেও সব ইলেকট্রিক ফিস ইলেক্ট্রোজেনিক নয়। বোঝার সুবিধার্থে, অনেক ইলেকট্রিক ফিস তড়িতক্ষেত্র শনাক্ত করতে পারলেও নিজস্ব তড়িতক্ষেত্র তৈরি করার ক্ষমতা রাখেনা। ইলেকট্রোজেনিক ফিস গুলোর মধ্যে ইলেকট্রিক ইল, ইলেকট্রিক ক্যাটফিশ এবং ইলেকট্রিক -রে অন্যতম। যে সেন্সোটিভ সেন্সরি অঙ্গানুর মাধ্যমে এই কাজটি সম্ভব হয় তাকে ইলেকট্রোরিসেপ্টর বলে। এটি তাদের বিভিন্ন প্রতিকূলতায় বস্তুকে শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিকে একটিভ ইলেকট্রোলোকেশন বলে। এই ইলেকট্রোরিসেপ্টর এবং একটিভ ইলেকট্রোলোকেশন এ দুভয়ের সহায়তায় সম্পন্ন করে ইলেকট্রোকমিউনিকেশন অর্থ্যাৎ আন্তঃযোগাযোগ। ইলেকট্রিক ইল মাছগুলো ৬০০ ভোল্টের কাছাকাছি ভোল্টেজ উৎপন্ন করতে পারে। তবে প্রজাতিভেদে এর তারতম্যে দেখা দেখা যায়। যেখানে মানুষ মাত্র ৫০ ভোল্ট মত সহ্য করতে পারে।

কিভাবে তৈরি হয়?

প্রথমত, তড়িৎক্ষেত্র কি! কোনো আহিত কনার চারপাশে যে অঞ্চল জুড়ে আহিত কনাটির আকর্ষন বা বিকর্ষন ক্ষমতা বজায় থাকে তাকে তড়িৎক্ষেত্র বলে। আহিত কনা কিংবা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের পরিবর্তন এই দুইভাবেই ইলেকট্রিক ফিল্ডের পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু ইলেক্ট্রোজেনিক ফিস গুলো তড়িতাহিত কনার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রটি তৈরি করে। এই

মাছগুলো শরীরে বিদ্যুৎ উৎপাদন কারী অঙ্গকে ইলেকট্রিক অর্গান বলে।এটিতে ইলেক্ট্রোসাইটস নামক ইলেক্ট্রোরিসেপটিভ সেল থাকে যাকে electrocytes or electroplaques or electroplaxes ও বলে।কোষগুলো সমতল ডিস্কের মতো হয়। ইলেক্ট্রোজেনিক মাছগুলোতে কয়েক হাজারের মতো এ ধরনের সেল থাকে যেগুলার প্রতিটি আবার 0.15V উৎপাদনে সক্ষম। কোষগুলো ATP(Adenosine triphosphate) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রোটিনের মাধ্যমে কোষের বাইরে সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম আয়ন পাম্প করে। পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে যখন মস্তিষ্ক কর্তৃক প্রেরিত নির্দেশ অনুসারে যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করা প্রয়োজন তখন মাছগুলোতে থাকা ইলেকট্রোসাইট গুলো নিজেদেরকে সিরিজের মত করে বিন্যস্ত করে এ পাম্প করার কাজটি সম্পন্ন করে। একে ফায়ারিং বলে। ফায়ারিং এর মাধ্যমে এদের শরীরের চারপাশে একটি ত্রিমাত্রিক ইলেকট্রিক ফিল্ডের সৃষ্টি হয় যাকে EODs বা ইলেকট্রিক অর্গান ডিস্চার্জ বলে। এই EODs দুইরকমের হয়।

১। পালস টাইপ

২। ওয়েভ টাইপ

শক্তিশালী ইলেকট্রিসিটি তৈরিকৃত মাছগুলোর EODs পার্লস টাইপের হয় অর্থাৎ ডিসি ইলেকট্রিসিটি উৎপন্ন করে (যে কারেন্ট বা ভোল্টেজ সময়ের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন তড়িতপ্রবাহ বজায় রাখে অর্থাৎ তড়িতপ্রবাহের দিক অপরিবর্তিত থাকে)। ইলেকট্রিক ইল, ইলেকট্রিক ক্যাটফিশ এই ইলেকট্রিক মাছগুলোর EODs পার্লস টাইপের। বিপরীতে, দুর্বল ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনকারী মাছগুলোর EODs মূলত ওয়েব টাইপের অর্থাৎ AC ইলেকট্রিসিটি (যে কারেন্ট বা ভোল্টেজ সময়ের সাথে এর দিক পরিবর্তন করে) উৎপন্ন করে। নাইফ, এলিফ্যান্ট নোজ নামের কিছু ইলেকট্রিক মাছ এ ধরনের কারেন্ট বা ভোল্টেজ উৎপন্ন করে।

এখন সবথেকে বড় যে প্রশ্নটা আসে, এত ভোল্টেজ সম্পন্ন শক্তিশালী ইলেকট্রিসিটি তৈরিকারী এ মাছটি কেন নিজেই তড়িতাহত হয়না?

ইলেক্ট্রোজেনিক এই মাছগুলো ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের এই ইলেক্ট্রিক অর্গান গুলো লেজের অগ্রভাগে অবস্থান করে যেখানে সামান্য পরিমানের রেসিসটেন্স উপস্থিত এবং মাছগুলো ফায়ারিং করবার সময় তাদের ইলেক্ট্রোসাইটস গুলো কে টর্চ লাইটের ব্যাটারির মত সাজিয়ে নেই তাই ২ মিলিসেকেন্ডের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। তাই এ সম্ভবনা একটু হলেও হ্রাস পায়। ইলেকট্রোজেনিক ফিস গুলো মেইনলি পানিতে থাকে আর বিশুদ্ধ পানি তড়িত অপরিবাহী। যেহুতু আমরা বিশুদ্ধ পানির বদলে মিনারেলস মিশ্রিত পানিই সব স্থানে পাই। তাই সেখানে

পানি কিছুটা হলেও পরিবাহী। তবে সেটা খুব শক্তিশালী হতে পারেনা। পানিতে না থেকে যদি স্থলে এরা থাকত তাহলে তড়িতাহত হওয়ার সম্ভবনা বেশি বাড়ত। তবে ইলেক্ট্রোজেনিক গুলো যে একেবারেই তড়িতাহত হয় না সেটি নয়। অনেক সময় এই ইলেক্ট্রিসিটি এদের হৃদপিন্ড বরাবর চলে গেলে তৎক্ষনাৎ এটি মারা যায়। তাই এরা বিশেষ করে ইলেকট্রিক ইল ফারায়িং করবার পূর্বে নিজেদেরকে U-shape এ সাজিয়ে নেই।

সমাপ্ত